REG: No. C, 87.

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲। জুন। ১৩০৬, আষাঢ়।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—নূতন বর্ষ, নাম-মাহাত্ম্য, লক্ষ টাকার কথা, অন্তিমে স্বপ্নাবসান, পিপাসার জল, দ্রব্যগুণ-বিচার, স্ত্রীজাতির গুণ, পতি-দেবতা, সদাই মনে রেখো, অগ্নি পরীক্ষা।

REG: No. C, 87.

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲। জুন। ১৩০৬, আষাঢ়।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—নূতন বর্ষ, নাম-মাহাত্ম্য, লক্ষ টাকার কথা, অন্তিমে স্বপ্নাবসান, পিপাসার জল, দ্রব্যগুণ-বিচার, স্ত্রীজাতির গুণ, পতি-দেবতা, সদাই মনে রেখো, অগ্নি পরীক্ষা।

প্রকৃতির শিক্ষা।

উৎকৃষ্ট ভাবময়ী পদ্য-পুস্তিকা। ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন। পড়িলে ভাবুকের মন প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখিয়া উন্মত্ত হয় ও ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া, ভগবানের দিকে স্রোতোরূপে বহিয়া যায়। মূল্য ।০ আনা। মফস্বলবাসী ।১০ আনা ডাঃ ষ্ট্যাম্প কবিরাজ মহাশয়ের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার (অন্যূন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটির উল্লেখ করিবেন।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা } { ১৩০৬ আষাঢ়। জুন।

নূতন বর্ষ।

ঋষির গতি—আমাদের এই পত্রিকার [illegible] [illegible]রালের সেই আসু[illegible] প্লেগ-দানবের সু-বিষম বিভীষিকার মধ্যে যখন চতুর্দ্দিকে লোক কেবলই হু হু-শ্বাসে পালাইতেছিল ; দোকান-কারখানা সব বন্ধ ; কম্পোজিটার অভাবে প্রায় সমস্ত প্রেস্ই অচল,—যখন লোকে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, আরব্ধ কার্য্যও সহসা-স্পৃষ্ট অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিতেছিল, আজ এই পুনরাগত আষাঢ়ে বিশ্ব-পাতার প্রসাদে ইহার একবৎসর পূর্ণ হইল। গ্রাহকগণ অবশ্য জানেন——ঠিক্ মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট দিনে অব্যভিচারিত নিয়মে ভগবৎকৃপায় আমরা এই পত্রিকা খানি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। যদি কেহ ঠিক্ সময়ে পত্রিকা না পাইয়া থাকেন তবে সে ডাকঘর-সংক্রান্ত ত্রুটী বা অন্য দুর্দ্দৈবাধীন ঘটিয়া থাকিবে।

আমরা ঋষি পত্রিকার নিয়মাবলিতে লিখিয়াছি 'পত্রিকার আকার ৩ ফর্ম্মা হইবে'—কিন্তু কার্য্যকালে মধ্যে মধ্যে সাড়ে তিন ও ৪ ফর্ম্মা দিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা গ্রাহকগণের অযাচিত অচেষ্টিত সুবহুল অনুগ্রহ পাইয়াছি,—ঋষি, মাসিক পত্রিকার চিরপ্রসিদ্ধ বিঘ্নপুঞ্জ ভেদ করিয়া নির্ব্বাধে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। ঋষির এই অবাধ গতির জন্য আমাদের মনে একটু শ্লাঘার সঞ্চার হয় ; যেহেতু, এই চাকৃচিক্যময় বেশ-বিলাসের দিনে—আপাত-প্রমোদ-প্রিয়তার রাজত্বে—ভস্ম-ধূসরিত বিকট

জটা-বেষ্টিত বুড়া বিট্‌কেল ঋষির কথায় কয়জন কাণ দিতে চায় ? ঋষি বাছ্-বাছা করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেছেন বটে, কিন্তু খাইতে দিতেছেন ক্ষেতের সেই দিশি চাউলের অন্ন, পল্‌তার ডাল্‌না, আর ঘি-কাঁচকলা! তিনি না দেন রসগোল্লা, না রাব্‌ড়ী, না একটু রসালো চাট্‌নী। তথাপি সুখের বিষয়—অনেকে ঋষির সকম্প-প্রসারিত আশীর্ব্বাদোন্মুখ হস্তের অস্বাদু প্রসাদের ভক্ত হইয়াছেন।

বিষাদের কথা—কিন্তু তথাপি কালের এমনই দোষ যে, কোনও পরিচিত বন্ধুকে হয় ত বলিলাম "ভাই! আমাদের ঋষির গ্রাহক হও, বছরে একটাকা, মাসে সোয়াপাঁচ পয়সা বই ত নয় ?" তিনি বলিলেন "আমার অনেক খরচ, একটাকা বছরে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।" কিন্তু সেই বন্ধুকেই সময়ান্তরে দেখিলাম [illegible] দেখিয়া তাহার কতগুণ বেশী পয়সা উড়াইতেছেন! আবার হয় ত, কোনও স্থলে মাসে মা[illegible]ছি—গ্রাহক বাবুর সব কথাই মনে থাকে, কিন্তু মূল্যের টাকাটী পাঠাইতে তিনি ভুলিয়া যান্—এ দুরদৃষ্ট মাসিক পত্রিকা মাত্রেরই। এই জন্যই মাসিক-পত্রিকা উঠিয়া যায়—তাই বলি, ধন্য নব্যভারত ও বামাবোধিনী—ধন্য রে তোদের কচ্ছপের আয়ুঃ!

আমাদের কাগজের আয়ুঃ—অনেকে আবার ইচ্ছাসত্বেও গ্রাহক হইতে ভয় করেন; কেন না, তাঁহাদের আশঙ্কা যে, অন্যান্য মৃত পত্রিকার নজীরের অনুসারে কাগজ হয় ত উঠিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে স্পর্দ্ধার সহিত সাহস দিয়া বলিতেছি—সম্পাদকের অকালে জীবনসমাপ্তি বা দুর্নিবার আধি-ব্যাধি ব্যতীত অন্ততঃ ১০ বৎসরের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ আমাদের কাগজ উঠিবে না। যেহেতু ইহাতে যে অকারাদি ক্রমে দ্রব্যগুণ বাহির হইতেছে, তাহা শেষ করিতে দশ বৎসর লাগিতে পারে। উহা শেষ করা সম্পাদকের বৃদ্ধমূল প্রতিজ্ঞা। দ্বিতীয়তঃ, এই পত্রিকা খানি কোন দুষ্য স্বার্থের জন্য করা হয় নাই। ইহা স্বকীয় ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের জন্য নহে। আর্থিক লাভের জন্যও নহে—লাভ হয়ও না। সম্পাদক চিরকাল যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াছেন, ব্যবসায়ের কালেও সেই চর্চ্চা কথঞ্চিৎ রাখিবার জন্যই তাঁহার এই সূত্র অবলম্বন। সুতরাং কাগজের অকাল-বিলোপ না হইবারই সম্ভাবনা। তবে ইতঃপর ঈশ্বরের মনে কি আছে তাহা তিনিই জানেন।

ঋষির উদ্দেশ্য—শরীর ও মন প্রথমে এই দুটী জগৎপাতার নিকট হইতে পাইয়াই মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হয়—বিদ্যা ধনাদি পরের কথা। ঐ দুটীই যাবতীয় সুখ-দুঃখ গুণ-দোষের মূল ভিত্তি-স্বরূপ। এই দুয়েরই সদসৎ পরিণামের জন্য মানুষ "মালিকের কাছে" জবাবদায়ী হইবে। শরীরের সৎপরিণাম—স্বাস্থ্যগত, মনের সৎপরিণাম—ধর্ম্মগত। শাস্ত্রে বলে "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমম্"। ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, আর মোক্ষই বল, সকলেরই মূল নীরোগতা। আরও উক্ত আছে 'এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যৎ তু গচ্ছতি॥' ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ যাহা নিধনেও সঙ্গে যায়। কিন্তু অন্য সকলই দেহ-নাশের সহিত নাশ-প্রাপ্ত অর্থাৎ সম্পর্ক-বিলুপ্ত হয়। ভাল হইবার ও ভাল করিবার কথা জানেন অনেকেই, কিন্তু সে সব জানিয়াও মানুষের মনে জাগরূক থাকে না। সে গুলি জাগ্রৎ রাখিবার একমাত্র সদুপায়—সাধুসঙ্গ। কিন্তু সকলের পক্ষে ত সাধুসঙ্গ সম্ভব হয় না, তজ্জন্য সাধুদিগের উক্তিগুলির সর্ব্বদা স্মরণ ও আলোচনাই তৎপক্ষে প্রশস্ত উপায়।

হঠাৎ হরিবোল বলিয়া সম্মুখভাগ দিয়া একটী শব লইয়া গেলে "আর পাপাচরণ করিব না" বলিয়া কতই না প্রতিজ্ঞা মনে উদিত হয়। কিন্তু সেই দেবভাবটী কতদিন থাকে? ধর্ম্মসভাতে কোনও উপদেশ-পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা শুনিয়া সভা-ভঙ্গ কালে লোক-সমুদয় যখন বহির্গত হইতে থাকে, তখনও কতজনের মনে (পূর্ব্বের মত) কত ভাবুকতা ও কত ধর্ম্ম-প্রবণতা উদিত হয়। কিন্তু সেই ভাবটীই বা কতদিন স্থায়ী হইয়া থাকে? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ যতই কু-প্রবৃত্তির দাস হউক না কেন, সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজক সুতীক্ষ্ণ কথাগুলি কর্ণগোচর হইলে মন একটু না একটু নিশ্চয়ই টলিয়া যায়! কিন্তু তত্তৎ বিষয়ের বিস্মৃতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ (এবং ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত।) এক কথায় সংসার-ক্ষেত্রে পরিধাবিত, বিষয়-ব্যাকুলিত মানবের সমক্ষে কোন না কোন স্মারক পদার্থ মধ্যে মধ্যে উপনীত হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সোজা কথায় মানুষকে পুনঃ পুনঃ "তাগাদা" না করিলে কখনই সেই অপরিহার্য্য বিস্মৃতির প্রতিবিধান হইতে পারে না। আমাদের এই পত্রিকাখানি ঐরূপ মাসে মাসে তাগাদা করিবার জন্যই দ্বারে দ্বারে উদিত হইতেছে।

এই এক বৎসর তাগাদায় যদি একজনের মনও উদ্বোধিত ও পবিত্রতার দিকে উন্মুখীকৃত হইয়া থাকে, তবে আমাদের ব্যয় ও শ্রমের যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ঋষির প্রবন্ধ—কলিকাতা ও মফস্বল হইতে অনেকে আমাদিগকে লেখেন "মহাশয়! ঋষিতে ধর্ম্মের কথা আর একটু বাড়াইয়া দিন, শুঁঠ, পিপুল মরিচের কথা পড়িয়া কি হইবে?" কেহ বলেন "ধর্ম্মাধর্ম্মির কথা অনেক শুনা আছে, "উহাতে প্রয়োজন নাই, আয়ুর্ব্বেদের কথা বেশী করিয়া লিখুন।" কেহ বা লেখেন উহাতে বেশ মিঠা মিঠা গল্প নভেল দিয়া পাঁচ ফুলের সাজী করুন, যেমন অন্যান্য কাগজে দেখিতে পাই।" কিন্তু আমরা জানি, একসঙ্গে সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা বৃথা, সুতরাং আমাদের কাগজের যে সুর, তাহাই থাকুক। বলি, যদি নভেল খুঁজিতে হয়, তবে ত ওরূপ কাগজের অভাব নাই, সব কাগজেই ত সেই একসুর।

আর আজ কাল যে সমস্ত নিত্য নূতন মাসিক পত্রিকা উদিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে প্রায়শঃ এইরূপ সকল বাজে কথাই লেখা থাকে, যথা—"নাচন্ত নগরে গোবর্দ্ধনকান্ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার তিনটী পুত্র—নগেন্দ্র, বগেন্দ্র ও জগেন্দ্র এবং তিনটী কন্যা—এ-বালা, ও-বালা আর সে-বালা। কন্যা তিনটী ক্রমে বয়ঃস্থা হইল। সেই বাড়ীর কাছে এক প্রতিবেশীর বাড়ী—সেই বাড়ীতে রসরাজ নামে একটী যুবক ছিল, ক্রমে এতে-ওতে চোখো-চোখি, দেখা দেখি, লেখা-লেখি, মাখা-মাখি, হতাশ! নৈরাশ!! ইহি-ইহি!! উহু-উহু!!! কত কি ঘটন-রটন হইয়া গেল!"—বলুন্ দেখি, এমন সব বাজে কথা শুনিয়া, কবে কাহার স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা হইবে?

একটু বিশেষত্ব—এই পত্রিকায় অভূতপূর্ব্ব রীতিতে অকারাদি ক্রমে দ্রব্যগুণ লিখিত হইতেছে—বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই বলিতেছেন এরূপ সুবিস্তীর্ণ দ্রব্যগুণ এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি লিখিত হয় নাই—ইহাতে দ্রব্যের দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম, উৎপত্তি-স্থান, আকৃতি-নিরূপণ, বিচার দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন, পাশ্চাত্য পরীক্ষায় নির্ণীত গুণান্তর, রসবীর্য্যাদি তত্ত্ব, প্রয়োগবিধি ও প্রচলিত লৌকিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি এক একটী গাছ গাছড়া সম্বন্ধে যত্‌কিছু জানিতে পারা যায় তৎসমস্তই লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক গাছ গাছড়া ঘটিত যে

সকল নানা মুষ্টিযোগ লিখিত হয়—সে গুলি স্ত্রীলোকেরা জানিয়া রাখিলে কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজকে ডাকিতে হয় না, তদ্দ্বারা গৃহস্থালীরও অনেকটা সাশ্রয় ও শান্তি হইতে পারে।

শেষ প্রার্থনা—এই পত্রিকা সকলেরই প্রয়োজনীয়—সকলেই ইহার গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন। সদুক্তি বা সুনীতির কথা যাঁহাদের ভাল লাগে না, আমাদের করপুটে নিবেদন—তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে ইহার গ্রাহক হউন্; যেহেতু অনিচ্ছাক্রমে চোক বুলাইতে বুলাইতেও যদি দু-একটী কথা মনে লাগিয়া যায়, তবে অপ্রিয় তিক্ত ঔষধের ন্যায় পেটে গিয়া নিশ্চয়ই গুণ দিবে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রাহকগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া ও যথাযোগ্যস্থানে স্নেহাশীর্ব্বাদ দান করিয়া পুনরায় নববর্ষের কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হইলাম। জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা দিন।

নাম-মাহাত্ম্য।

ভাই ভাইএ বিবাদ চিরকালই আছে। শুধু আজকালকার ছেলে পিলেদের ভিতর নয়—শুধু অল্পবুদ্ধি মানুষের ভিতর নয়, যুগযুগান্তর পূর্ব্বে দেবতাদিগের মধ্যেও এই বিবাদ দেখা যায়। সে বহুদিনের কথা—যে কথা বলিব মনে করিয়াছি—সে বহুকাল পূর্ব্বের কথা। এক দিন শিবের মালা লইয়া কার্ত্তিক ও গণেশে বিবাদ বাধিয়াছিল। শিব—ভোলা মহেশ্বর—যেথানে যা পান, তাই লইয়াই তাঁর আনন্দ। জানি না, কি জন্য, কি কাজে লাগে তাও জানি না, বিবাদ সেই হাড়ের মালাছড়াটী লইয়া। অনেক শ্মশান ঘাঁটিয়া, হাড় সংগ্রহ করিয়া, পাগল মহেশ—"পাগল" কিনা তাই—শ্মশান হইতে কতকগুলি হাড় কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া আপনার গলায় ধারণ করিয়াছেন। ছেলে দুজনের মধ্যে সেই মালা ছড়াটীর জন্য বিবাদ। তারা শুনিয়াছে যে, সেই মালা ছড়াটীর শক্তি না কি অনন্ত। অনন্ত গুণ যে কি, তা' পাগল ভোলা বোঝেন, আর তাঁর ছেলে দুটী তাঁর কাছে না কি শুনিয়া বুঝিয়াছে। গুণ যাই হোক, তারা কিন্তু আর বোধ মানে না, এ বলে আমার

চাই, ও বলে আমার চাই। শিবের প্রবোধ-বাক্য আর তাহাদিগকে থামা-ইতে পারে না—শিবও বিব্রত; কারে রাখিয়া কারে দেন, স্থির করিতেই পারিলেন না। তখন তিনি বসিয়া একটা মতলব স্থির করিলেন ভাল। "পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আজ যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, এই মালা তাহারই প্রাপ্য"। হুকুম শুনিয়া কার্ত্তিক আমোদে আটখানা। তাহার বাহন ময়ূর, বায়ুবেগে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিবে। আর গণেশ ইঁদুরে চড়িয়া কত দিনে যাইবে?

কার্ত্তিক সহাস্যবদনে তৎক্ষণাৎ তীর্থযাত্রায় বাহির হইল, কিন্তু গণেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। খানিক পরে গণেশ আর সে গণেশ নাই। সে যেন তীর্থ-ভ্রমণের জন্য কি এক আশ্চর্য্য বাহন পাইয়াছে। কিন্তু কৈ তার ত যাত্রার কোন উদ্যোগই দেখিতেছি না! তবে হইল কি?

এখন গণেশ আর সে ভাবে বসিয়া নাই ত! দু'হাতে খোল ও দু'হাতে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন—যে নামে মহেশ পাগল, নারদ বৈরাগী সাজিয়া গান গাহিতে গাহিতে বিভোর—বাহ্যজ্ঞান শূন্য, চৈতন্য চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী, বৃদ্ধা জননী ও সমুদায় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, একদিন যে নামের তরঙ্গে গঙ্গা উজান বহিত, পশুপক্ষী নীরব নিস্তব্ধভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া থাকিত, পাষাণও দ্রবীভূত হইত—সেই হরিনাম, সেই মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। স্নান নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, বেলার দিকে লক্ষ্য নাই, বাহ্য জ্ঞান নাই—মুখে কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল'। গণেশের সেই সরল প্রাণের মধুর হরিবোল-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত, তাহার সেই উদ্দণ্ড নৃত্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত।

দিবা অবসান প্রায়। গণেশ বাহ্যজ্ঞানহীন। কার্ত্তিকের সঙ্গে দেখাই নাই। গণেশের হরিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত। মহেশ্বর মহাভাবে বিভোর—আর থাকিতে পারিলেন না, দৌড়িয়া গিয়া গণেশকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আর বারম্বার মুখচুম্বন করিয়া, আপনার সেই অতি যত্নের ধন—শিবের সেই হৃদয়সর্ব্বস্ব সেই মহা-শক্তি মালা গাছটী গণেশের গলায় পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, বৎস! তোমার তীর্থ পর্য্যটন অনেকক্ষণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আজ আমি তোমার মত পুত্ররত্ন পাইয়া ধন্য হইলাম। ধন্য জগন্মোহন হরিনাম, ধন্য হরিনামের অনন্ত শক্তি। আজ একমাত্র হরিনাম প্রভাবে গণেশজননী—কর্ম্মফল নাম-বলের নিকট পরাস্ত।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥

শ্রীগুরুপদ যোগবিশারদ।

লক্ষ টাকার কথা।

গুরু-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক সুন্দর রূপ, সুন্দরী রমণী,
মেরুতুল্য ধন, কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক কলত্র পুত্র পৌত্র বহুধন,
থাকুক সুন্দর গৃহ, আত্মীয় স্বজন,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক ষড়ঙ্গ বেদ মুখে অনিবার,
থাকুক সামর্থ্য গদ্য পদ্য লিখিবার,

গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

থাকুক স্বদেশে আর বিদেশেও মান,
থাকুক মহতী নিষ্ঠা সদা বিদ্যমান,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

এই ভূমণ্ডলে যত রাজরাজেশ্বর
সেবা করে পাদপদ্ম যাঁর নিরন্তর,
সেই গুরু-পাদ-পদ্মে না রহিলে মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাৎ জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

যাঁহার কৃপায় নিত্য বহুদান করি
ছুটিয়াছে যশ মোর দশদিক্ ধরি,
জগতের উপাদেয় সামগ্রী সকল
যাঁহার কৃপায় মোর করে অবিরল,
সেই গুরু-পাদ-পদ্মে না রহিলে মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

যোগ ভোগ অশ্বগণ থাকুক আমার,
থাকি বা নারীর সুখে মত্ত অনিবার,
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

কিবা গেহে, কিবা দেহে, কিবা বনে আর
কিবা কার্য্যে নাহি যায় হৃদয় আমার।
অমূল্য গুরুর পদে না রহিলে মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্ সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

রত্ন-ভোগ-সুখে ছিনু উন্মত্ত হইয়া,
যামিনী কাটায়ে দিনু কামিনী লইয়া।
গুরু-পাদ-পদ্মে যদি না রহিল মন,
কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কথন!

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী যতি র্ভূপতি র্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্ বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥

কিবা পুণ্যবান্ জন, কিবা আর যতি,
কিবা গৃহী, ব্রহ্মচারী, অথবা ভূপতি,
গুরু বাক্যে যদি তাঁর নিত্য রহে মন,
এ স্তব করেন পুনঃ মুখে উচ্চারণ,
তাহা হ'লে মহা-পুণ্য এই শ্লোকচয়,
ব্রহ্মপদ মিলাইয়া দিবেক নিশ্চয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ।

অন্তিমে স্বপ্নাবসান।

এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! তরঙ্গিত হৃদয়ের তরল লহরীলীলা অন্ধকার করিয়া সেই সুখ-শশী কোন্ জলদজালে মুখ লুকাইল? এত আঁধার! এত নির্জ্জন! এত নীরবতার রাজত্ব! এখানে কেহ নাই—আমি একা। এই অন্ধকার রূপ পাষাণ-প্রকোষ্ঠে আমি একা। সঙ্গীহারা পথিকের মত পথ খুঁজিতে খুঁজিতে

কোথায় চলিয়া যাই, ভগ্নহৃদয় প্রণয়ীর মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, শরতের মেঘের মত উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যাই। আমায় স্মৃতি বলিয়া দেয়—আমি একা। ঐ যে স্বর মিলাইয়া যায়, ঐ যে স্বরতরঙ্গের শীকরসুলভ শৈত্যের মত "হরিধ্বনি" মিলাইয়া যায়, উহা কেমন মধুর! কেমন মনোমদ! কত মধুর গীত শুনিয়াছি, কত বেণুবীণার স্বরতরঙ্গে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছি, কিন্তু এমন মিষ্ট স্বর ত কোথাও শুনি নাই। ধ্বনি গো, জাগিয়া থাক, এই নীরব নিঃসঙ্গ প্রাণের অন্তরালে থাকিয়া, তরঙ্গিত হইয়া উঠ, "বল হরি হরি বোল"।

এ বার সকলই নীরব হইল। সকলই মিলাইল। এখন আমি একা। আলোকময় উপকূল পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে যেন দিশাহারা সাগরবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছি। সব আলোকই অদৃশ্য, সব স্মৃতিই বিলীন; কিন্তু একটী আলোক যেন মিশাইতে চায় না, কে যেন একটী সুরকে ভুলিতে দেয় না,—"বল হরি হরিবোল"। কে জানে কেন এই সুর সদাই কাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদাই প্রাণের দুয়ারে গিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করে। সে স্বপ্নময় রাজত্বের স্বপ্নময়ী কারামুক্তির শেষ দিনে, কি মধুর স্বরই আমাকে মাতাইয়াছে,—"বল হরি হরি বোল"

কে জানে ও নামের ভিতর কি আছে। এই যে এত আঁধার, এই যে এত অবসাদ, ঐ নাম যেন তাহাদের ভিতর বিজুলী খেলাইয়া গেল। এ অশরীরী শরীরে যেন বল পাইলাম। এই অশরণ জীবনে যেন আশ্রয় মিলিল। জীবন্ত পাপের মূর্ত্তি জলধর, ইন্দ্রধনু ধরিয়া, ঈর্ষাবশে যখন হিমাদ্রির হৈম কিরীট আক্রমণে উদ্যত হয়, তখন গিরিরাজ অগ্নিময় বিদ্যুৎবাণে তাহাকে বিদ্ধ করেন। মেঘ কাঁদিতে কাঁদিতে গগণ-প্রাঙ্গনে মিশাইয়া যায়। পাপপুষ্ট ক্ষুদ্রজীব সেইরূপ হরিনামের সুতীক্ষ্ণ শরে আত্মহারা হইয়া পড়ে, সেই অপার অমৃত-সাগর-বক্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকার মত, দুর্ব্বল পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া যায়। ভাসিয়া কোথায় যায় কে জানে? কে জানে সে কোন্ তরঙ্গাঘাতে মরিতে মরিতে অমৃতস্পর্শে আবার অমর হইয়া উঠে।

আমি মরিয়াছিলাম, কিন্তু অমর হইয়াছি সেই নাম শুনিয়া "বল হরি হরিবোল"। আমি ক্ষুদ্র জীব ছিলাম, কিন্তু শিবত্ব লভিয়াছি সেই নাম শুনিয়া

"বল হরি হরিবোল"। যাহার নামের এত গুণ না জানি সে কেমন! সে বাঁশীর মত কঠোর, কিন্তু তাহার স্বরের মত কোমল। সে বিরহের মত দাহক, কিন্তু বিরহীর মত ব্যাকুল। সে চাঁদের মত সুন্দর, কিন্তু কলঙ্কের মত কৃষ্ণ। সে মনের মত চঞ্চল, কিন্তু ধ্রুবের মত স্থির। আমি তাহাকে ভালবাসি কি না জানি না কিন্তু সে আমাকে ভাল বাসে। ভালবাসা কথাটী কি মধুর! এ কি মায়া না আর কিছু? মায়া বলিলে সংসার বুঝায়—মায়া ও স্বপ্ন একই কথা। স্বপ্ন বর্ত্তমানে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে অসার। কিন্তু ভালবাসা? ভালবাসা স্বপ্ন নয়—অমর্ত্ত্য জাগরণ। ভালবাসা ভগবানের জীবন্ত অনুগ্রহ। সেই আমার প্রাসাদের কথা মনে নাই, কিন্তু সোহাগিনীর কথা মনে আছে। সে আমায় ভাল বাসিত, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত, প্রাণের প্রাণ প্রেম দিয়া ভাল বাসিত। প্রেম কি অমূল্য রত্ন ভাই! কাহার সহিত প্রেমের তুলনা দিব? রূপ? এ দরিদ্র ত কেবল নেত্রের দ্বারে ভিখারী। যদি নেত্রের কপাট বন্ধ করিয়া দি, তবে তাহার গরিমা আকাশেই ভাসিয়া যায়। বিষয়পঞ্চক, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ হইয়া মনকে চুরি করিতে কত রূপই ধারণ করে। কিন্তু প্রেম? বাহিরে ভিতরে—ভিতরে বাহিরে একই রূপ। প্রেমিক রাবণ যে দিকেই চাহে, সেই দিকেই রামমূর্ত্তি, চোক বুজিতে চায়, সেখানেও সেই রাম। শেষে সে রাম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, সন্তরণে শান্তির পারে উঠিল। প্রেম ও ভালবাসা একই পদার্থ। সে আমায় ভালবাসে আমি তারে ভালবাসি, "বল হরি হরিবোল।"

এই শেষ দিনে, অভিনয়ের এই শেষ অঙ্কে, একবার উচ্চৈঃস্বরে "বল হরি হরিবোল"। কোলাহলময়ী ধরিত্রীর মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া, যে ব্যোমযান অকূল শূন্যপানে, অপরিচিত সুখ দুঃখের আলোকান্ধকারে ছুটিয়াছে, একবার তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া গগণস্পর্শী স্বরে, বন্ধুবান্ধবগণ! "বল হরি হরি বোল"।

নেত্রের সলিল নেত্রে সংবরণ করিয়া, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে বাঁধিয়া, সাবিত্রীর সিন্দূর ললাটে পরিয়া, পতিসোহাগিনি! উচ্চৈঃস্বরে "বল হরি হরি বোল।" নাড়ীর বন্ধন অনেক দিন ছিঁড়িয়াছে, প্রাণের পিঞ্জরে অনেক দিন পুষিয়াছ, মৃত্যুর শঙ্কায় অনেকবার কাঁদিয়াছ, এখন মা, স্নেহের বন্ধন কাটিয়া

"বল হরি হরিবোল"। পিতার পা ছাড়িয়া দাও, আদরের দড়ি দিয়া আর বাঁধিও না। শিশু, মায়ের কোলে উঠিয়া "বল হরি হরিবোল।" অশ্রুজলে চিতা নির্ব্বাণ করিয়া "বল হরি হরিবোল।" গঙ্গার সলিল গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া "বল হরি হরিবোল"। এই সংসার রূপ শ্মশানের সুখময়ী চিতা-শয্যায় শয়ন করিয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে "বল হরি হরিবোল"।

(এখন) সাধের স্বপন ভাঙল রে ভাই কোন্ দিকে ধাই
পাই না ভেবে।
বল হরিবোল বল হরিবোল, হরি বিনে কূল
আর কে দেবে।
(এখন) থেমে গেছে মায়ার বাঁশী, থেমে গেছে আশার হাসি,
নৌকা আশে যাচ্ছি ভেসে, কাণ্ডারী কি তুলে নেবে।

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ।

পিপাসার জল।

সে অনেক দিনের কথা। আমি আর বড় দাদা এক সঙ্গে থাকি। এক দিন রবিবার; দাদার আফিস বন্ধ। কিন্তু তাতে কাজের কামাই নাই। এক তাড়া আফিসের কাগজ বড় দাদার শয়নঘরে জমা। বেলা দুই প্রহর; চৈত্র মাসের সূর্য্য একেবারে মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন সেই প্রখর রৌদ্রের জ্বালায় কাতর হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের সাড়া শব্দ নাই; কোন্ এক যাদুকরের মোহিনী মায়ায় যেন সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দ্বিপ্রহর সময়ে দাদা তাঁর আফিসের কাগজ পত্র খুলিয়া বসিয়াছেন; সরকারী কর্ম্মচারীর আর শনিবার রবিবার নাই। বড় বৌদিদি সুতরাং দাদার কাছে আসর জমাইতে না পারিয়া পাঁচ বৎসরের মেয়ে সুরোকে লইয়া আমার স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিলেন। মেয়েটী আমার

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। আমি তার কথার কোনটার বা উত্তর দিতেছি, কোনটা বা 'জানি না' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ীর পাশেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিগের বাড়ীর উঠানের চাঁপাগাছ হইতে একটা পাখী সেই নীরব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'ফটিক্ জল।' সুবিশাল আকাশমার্গ সেই পাখীর শব্দে যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন একটা ব্যাপারের উপর প্রশ্ন করিবার জন্য সুরো প্রস্তুত হইল। মাথা তুলিয়া দুই একবার পাখীর করুণ কণ্ঠের 'ফটিক জল' শুনিয়া আমার সেই স্নেহময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রশ্ন করিয়া বসিল 'পাখী কি বলে।' আমি বলিলাম 'ফটিক্ জল'। তাহার পর প্রশ্ন 'কেন বলে ?' এ প্রশ্নের উত্তর আমার জ্ঞানভাণ্ডারে ছিল না ; সুতরাং বালিকার এ কথার উত্তর দিবার জন্য বড় বৌদিদির শরণ লইতে হইল। তিনি তখন এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম মোটামুটী এই যে, এক বাঘিনী শাশুড়ী পুত্রবধুকে বড়ই কষ্ট দিত। এক দিন শাশুড়ী-বউ দুই জনে ধান ভানিতে ছিলেন, এমন সময়ে বধূর জলতৃষ্ণা পাইল ; বধূ ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীর নিকট একটু জল খাইতে যাইবার অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। শাশুড়ী মনে করিলেন, বউ বুঝি একটা ওজর করিয়া বিশ্রাম করিবার ফন্দী করিল, তাই তিনি রাগে অধীরা হইয়া বৌকে একটা ঠোনা মারিলেন। বউ অমনি ঢলিয়া পড়িল, তাহার প্রাণবায়ু তৃষ্ণার জ্বালায় পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে যখনই বড় রৌদ্র হয়, তখনই সেই পাখী 'ফটিক জল' বলিয়া কাতরকণ্ঠে তাহার গভীর তৃষ্ণার কথা ঘোষণা করে। গল্পটী বেশ। কিন্তু যাহাকে শুনাইবার জন্য, যাহার প্রশ্নের উত্তরের জন্য বৌদিদি এই গল্পের অবতারণা করিয়া ছিলেন, সেই প্রশ্নকর্ত্রী তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ; আমারও একটু ঘুমের ঘোর হইয়া ছিল। বড় বৌদিদি এমন অসভ্য শ্রোতৃবৃন্দের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার দাদার কক্ষদ্বারে উমেদারী করিতে গেলেন।

আবার সমস্ত গগণ শব্দিত করিয়া পাখী ডাকিল 'ফটিক জল'। আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল, আমি সুধুই শুনিতে লাগিলাম সেই আর্ত্তস্বর, সেই

তৃষাতুরের আকুল আবেদন। পাখীর কথা ভুলিয়া গেলাম। আমার মনের মধ্যে আর একটী হৃদয়ভেদী দৃশ্য জাগিয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী। তাঁহারই চাঁপাগাছ হইতে সেই করুণ আর্ত্তনাদ আসিতেছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার একমাস পূর্ব্বে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এক অতি শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, তাঁহার বয়স প্রায় ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সংসারে কেবল তাঁহার বিধবা ভগিনী রঙ্গিণী, তাঁহার স্ত্রী, এবং তাঁহার ৪টী শিশু সন্তান, এবং সেকেলে একটী বুড়ো চাকর, নাম—গদা। স্ত্রীটী দ্বিতীয় পক্ষের, কর্ত্তার প্রাণের অমূল্যনিধি, তুলো জড়ান বাক্স-বন্ধ মনকাবৎ আদরের ধন! আর রঙ্গিণী?—তাহার মত দুঃখিনী জগতে নাই। সংসারের সমস্ত কাজের ভার তাহারই ঘাড়ে, অথচ পরণে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, মরিলে 'আহা' বলিবার লোক নাই! রঙ্গিণী সারাদিন খাটিতে খাটিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া যখন মরু-বায়ুর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তখন সে নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, হয় কেবল বৃদ্ধ গদার ছলছলায়িত বয়োদগ্ধ আঁখি দুটীতে। কেননা গদাধর রঙ্গিণীকে রাঙ্গা খুকী, অরক্ষণীয়া আইবড় মেয়ে এবং পরগৃহলক্ষ্মী—এই তিন অবস্থাতেই দেখিয়াছে—এবং এক রকম নিজ হাতেই মানুষ করিয়াছে। খুব বড় লোকের ঘরেই রঙ্গিণীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে সবকূলের সম্বল হারাইয়া আজ সে উদরান্নের জন্য ভ্রাতার গলগ্রহ।

গদা ছেলে বেলার রাঙ্গা খুকীকে এখন রাঙ্গাদিদি বলে, নিশীথকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ বৃদ্ধ ভৃত্য তাহার রাঙ্গাদিদির সম্বন্ধে কোন কোন দিন এই রূপ ভাবে—আহা এমন রূপ! এই কচি বয়েস! সবে এই ষোল বৎসর! এখনও জীবনের অনেক দিন বাকী আছে, এত কষ্টে দিদির কিরূপে কাটিবে? যাই, কলিকাতায় লইয়া যাই, শুনিয়াছি আমাদের মেজ খোকা যার বই পড়ে (বর্ণ পরিচয়), সে না কি বিধবাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কি এক উপায় করিয়াছে। তার কাছেই এই হতভাগিনীকে গছাইয়া আসি।

বিধবা! আর আমি বলিতেছি কি? গদা ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ মীমাংসা এই টুকু করে যে—অন্তিম শান্তিনিদান মৃত্যুর কোল ছাড়া রঙ্গিণীর আর জুড়াইবার স্থান নাই। বৈশাখ মাস। ছোট খোকার অন্নপ্রাশনের দিন উপস্থিত। মুখুজ্জে মহাশয় এই সূত্রে গ্রামের দশজন ভদ্রলোককে খাওয়াইবেন। তাই আয়োজন হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারবিধানে খাটিবে কে? মুখুজ্জে ঠাকুর পৃথিবীর সব স্ত্রীলোককেই বড় ঝগ্‌ড়াটে মনে করেন; তাঁহার স্ত্রী এমন শান্ত সুশীলা ভাল মানুষ; অথচ পোড়া পাড়ার লোক বা অন্য আত্মীয়া কুটুম্বিনী—ইহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া দুদণ্ডও কাটাইতে পারে না। তাই ঠাকুর মহাশয় মনে করিলেন, কোনও স্ত্রীলোককে বাড়ীতে আনা হইবে না। কাজের লোকের ভাবনা কি? রঙ্গিণী ত ষাঁড়ের মত শক্ত, সে আছে কিসের জন্য। সব কাজ সেই করিবে। আর গদা পুরোনো ইট, একাই দশ জনের তুল্য, আর বাজে লোকের আবশ্যক কি?

এইবার গদা ও হতভাগিনীর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পালা পড়িল—(আর কবেই বা না পড়ে?) রঙ্গিণীর দু তিন দিন আগে জ্বর হইয়াছিল, সবে অন্ন পথ্য করিয়াছে। আবার দৈবক্রমে অন্নপ্রাশন একাদশীর দিনে পড়িয়াছে। মুখুজ্জে মহাশয়ের বাড়ী দু তলা, অতি পুরাতন, সিঁড়ি উঁচু নীচু, ইট বাহির করা; উঠানে রান্নাঘর দুখানা ঘর পরস্পর হইতে অতি দূরে দূরে। দু এক বার যাতায়াত করিলেই পাহাড় ভ্রমণের পরিশ্রম অনুভূত হয়। রঙ্গিণী একাকিনী এই সীমার মধ্যে উপর-নীচে ছুটাছুটী করিতে করিতে সারাদিন পরে তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া ভূমিশায়িনী হইল। জ্বর আবার ফুটিল। একাদশীর উপবাস, তায় ভয়ানক খাটুনী, তার উপরে সর্ব্বদেহদহনকারী উত্তাপ। ভয়ানক পিপাসা! জ্বরের ঘোরে রঙ্গিণী বলিয়া উঠিল তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেল—একটু জল দাও! ওগো তোমাদের পায়ে ধরি একটু জল দাও।

তৃষাতুরের এই মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ শুনিয়া গদাধর জল দিবার জন্য ঘটী হাতে করিয়া ছুটিল। এ দিকে মুখুজ্জে মহাশয়ের সেই অগ্নিরূপিণী ঘরণী পেছন হইতে রঙ্গিণীর চুল টানিয়া বলিল—ওরে কালামুখী কুলটা, একাদশীর দিনে জল খাওয়া কি লা? চণ্ডালিনী তুই কি আমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিবি?

গদা আসিয়া দেখিল—জল খাবার লোক ফুরাইয়াছে! পিপাসা-প্রজ্জলিত দেহে প্রাণ-পাখী থাকিতে না পারিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। গত তিরস্কারের শেষাংশ গদার ঘাড়েই পড়িল। গদা চোখ মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেল।

দিনে দিনে সে সব কথা ভুলিয়া গেলাম কিন্তু আজ এই দ্বিপ্রহরে যখন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চাঁপা গাছের মধ্য হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিল 'ফটিক্ জল' তখন সেই এক মাস পূর্ব্বের হৃদয়ভেদী দৃশ্য আমার নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমি সুধুই শুনিতে লাগিলাম হতভাগিনী রঙ্গিণী বলিতেছে—তৃষ্ণায় ছাতি ফটিয়া গেল, একবিন্দু জল দাও, জল দাও। আমার মনে হইতে লাগিল পাখী আর কেহ নহে, পাখী সেই রঙ্গিণী। আজ এই রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া কাতরকণ্ঠে নিষ্ঠুর স্বজনের কাছে প্রার্থনা করিতেছে 'ফটিক্ জল'। চম্পক বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রের অন্তরাল হইতে যেন সেই তৃষাতুরের আবেদন স্বর্গপথ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতেছে 'ফটিক্ জল'। পাখীর কথা ভুলিয়া গেলাম; সুধু দেখিতে লাগিলাম—ব্রাহ্মণকন্যা বালিকা রঙ্গিণী একবিন্দু জলের জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে আর বলিতেছে 'ফটিক্ জল'। কি হৃদয়ভেদী সেই স্বর! এখনও আমার মনে আছে। এখনও যদি কোন দিন নিঝুম দ্বিপ্রহরে আকাশমার্গ বিদীর্ণ করিয়া পাখী ডাকে 'ফটিক্ জল', তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণের ভিতরে সেই লুকান বেদনা জাগিয়া উঠে, রঙ্গিণীর সেই তৃষাকাতর মলিন মুখ আমার মনে পড়ে, সেই দীননয়নে একবিন্দু জলের জন্য কাতরতা মনে পড়ে, আর শরীর শিহরিয়া উঠে!

তখন ভাবি—এ কাতরকণ্ঠ কি শুনিয়া ব্যথিত হইবার কেহ নাই? এ দুঃখকাহিনী কি ব্যোমবায়ুতেই মিলাইয়া যায়? কখনই নহে। ইহার অবশ্য শ্রোতা আছে। উপরে বসিয়া এক জন নিত্য নিত্য দুঃখীর আর্ত্তনাদের হিসাব রাখিতেছে।

শ্রীজলধর সেন।

দ্রব্যগুণ-বিচার।

ঈশ-লাঙ্গলা।

বাঙ্গালা নাম—ঈশলাঙ্গলা বা বিষলাঙ্গলা ; হিন্দী—করিহারী ; ইংরাজী—Gloriosa Superba or Aconitum napellus. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি। বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ॥ সংস্কৃত নাম—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা, গর্ভনুৎ। এতদ্ব্যতীত ইহার এই কয়টী নাম দৃষ্ট হয়—বিদ্যুজ্জ্বালা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, অগ্নিমুখী, ঈশ্বরী।

লতা-গাছ হয়, ক্ষুদ্রাবস্থায় স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকে, বড় হইলে অন্য বৃক্ষকে আশ্রয় করে। ইহার পাতা খাট-চওড়া বাঁশপাতার মত, তদপেক্ষা মোটা ও নরম, এবং ফিঁকে সবুজ। আদার পাতা গুলি যেরূপ ডাঁটার দুইপাশ হইতে উঠিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে সাজানো থাকে, ইহারও প্রায় সেইরূপ। ইহার ফুল লালবর্ণ, দেখিতে বড় সুন্দর—কতকটা অশোকফুলের মত, কিন্তু তদপেক্ষা একটু বড় ; ইহার মূল মোটা শতমূলীর মত, কিন্তু শতমূলী যতদূর শাদা এবং যেরূপ ক্রমে অত্যন্ত সরু হইয়া যায়, ইহা সেরূপ নহে, এক খণ্ড হরিদ্রা বা আদা ঈষৎ বাঁকা হইয়া ৮।১০ অঙ্গুলি লম্বা হইয়া জন্মিলে যেরূপ আকৃতি হইত, ইহা প্রায় তদ্রূপ ; ঔষধার্থ এই মূল ব্যবহৃত হয়। ইহা একজাতীয় বিষ। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নয় বলিয়া শাস্ত্রে এই জাতীয় বিষের নাম উপবিষ। "অর্ক" দেখুন।

কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
সক্ষারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী॥

রস—ক্ষার-তিক্ত-কটু-কষায় ; বিপাক—কটু, বীর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—লঘু, শ্লেষ্মহর, পিত্তকর, তীক্ষ্ণ, কুষ্ঠ শোথ অর্শঃ ব্রণ ক্রিমি ও শূল নাশক। (শূল নাশক অর্থাৎ বাহ্য প্রলেপে স্থানীয় ব্যথা নাশক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উদরাদির শূলনাশক হইতে পারে, যেহেতু বিষমাত্রই

আগ্নেয়, এবং অধিকাংশ আগ্নেয় বস্তুই শূলনাশক; কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না)। প্রভাব—সারক, গর্ভপাতকারক।

প্রয়োগ—ইহার মূল দেখিতে অনেকটা মিঠা বিষের ন্যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদেরা ইহাকে এক প্রকার মিঠা-বিষ (Aconite) মনে করেন; তবে মিঠা-বিষের অপেক্ষা ইহা ঈষৎ মৃদু, ইহার মাত্রা ৵০ আনা পর্য্যন্ত। মিঠাবিষের প্রয়োগ যেমন জ্বর বাত কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে আছে, ইহারও সেইরূপ। আমরা শুনিয়াছি, জারিত তাম্রকে ৭ বার বিষলাঙ্গলার রসের ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় যথাযুক্ত অনুপান সহ ব্যবহার করিলে জ্বর ও শূলরোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শরীরের কোনও স্থানে ব্যথা বা ফোলা থাকিলে, ইহার শিকড় বাটিয়া দিলে অতি শীঘ্র শান্তি হয়। শুধু বিষলাঙ্গলার প্রয়োগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার শক্তি বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে ফললাভের আশা আছে। ডাক্তার মুদন সরীফ বলেন—"ইহা বিষাক্ত কি না দেখিবার জন্য আমি নিজে ক্রমে ক্রমে ১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাইয়াছিলাম তাহাতে কোনও কু-লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, বরং ক্ষুধাবৃদ্ধি, স্ফূর্ত্তি ও বলবৃদ্ধি অনুভব করিয়া ছিলাম। আমি প্রায় ষোল বৎসর চিকিৎসা প্রসঙ্গে ইহা ব্যবহার করিতেছি; ইহার সাধারণ মাত্রা—৫ হইতে ১২ গ্রেণ, দিনে তিন বার সেব্য।" বোম্বায়ে পশুদিগের ক্রিমি মারিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। মান্দ্রাজে সর্পবৃশ্চিকাদি-দষ্ট স্থানে ইহার প্রলেপ দেওয়া হয়। তথায় ইহা দুই প্রকারের আছে বলিয়া পরিচিত; এক প্রকারের মূল ৩।৪টী হইয়া ভিন্ন ভাবে বাহির হয়, অন্য প্রকারের কেবল একটী মূল নির্গত হয়। বহুমূলযুক্তকে মান্দ্রাজীরা পুরুষ ও একমূলকে স্ত্রীজাতি বলে। এই পুরুষ জাতীয় গাছের মূল তাহারা চাকা চাকা করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোলে ডুবাইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া পরিশেষে সযত্নে শিশিতে রাখিয়া দেয়। কাহাকেও সাপে কাটিলে দু-এক চাকা খাওয়াইয়া দেয়।

জ্বর বিকারের "কালানল" রস ও "প্রতাপলঙ্কেশ্বর রসে," ভগন্দরের "বিষ্যন্দন তৈল" ও "করবীরাদ্য তৈলে" এবং কুষ্ঠের "বৃহৎ সোমরাজী তৈল" ও "বৃহৎ মরিচাদি" প্রভৃতি তৈলে বিষলাঙ্গলা আবশ্যক হয়।

উড়ুম্বর।

বাঙ্গালা নাম—ডুমুর ; হিন্দুস্থানী—গুল্লর ; ইংরাজী—Fig tree. সংস্কৃত **পর্য্যায়ঃ**—উড়ুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধক। সংস্কৃত নাম—উড়ুম্বর বা উডুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেমদুগ্ধক। ইহার অন্য নাম—অপুষ্পফল, শীতবল্কল, সদাফল, ক্রিমিকণ্টক, পুষ্পহীনা, ব্রহ্মবৃক্ষ, সুচক্ষু, শ্বেতবল্কল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞ-যোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত, পবিত্রক, সৌম্য, জঘনেফল।

ডুমুর গাছ অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন—এই গাছ বটাদিবর্গ ও পঞ্চ-ক্ষীরিবৃক্ষের অন্তর্গত। পঞ্চক্ষীরি বৃক্ষ (অর্থাৎ দুগ্ধ বা শাদা রস আছে যাহাদের তাহারা) যথা—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীশ (পলাশ পিপুল) ও পাকুড়।

এই গাছ সাধারণতঃ মানুষের ৩।৪ গুণ উচ্চ হয়, পাতা ৪।৫ অঙ্গুলী চওড়া, ৫।৬ অঙ্গুলী লম্বা এবং অত্যন্ত কর্কশ ; কিন্তু পশ্চিম দেশে এক একটা প্রকাণ্ড গাছও দৃষ্ট হয়, অত্যন্ত-বড় হইলে গাত্র হইতে বটের ন্যায় সরু সরু বোয়া নামে। সংস্কৃত উড়ুম্বর বা উডুম্বর শব্দের 'উ' খসিয়া গিয়া ক্রমে বাঙ্গালা ডুমুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

ডুমুর দুই প্রকারের আছে, যজ্ঞডুমুর ও সাধারণ ডুমুর। সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের ফল ৩।৪ গুণ পর্য্যন্ত বড় হয়। এখানে উড়ুম্বর শব্দের দ্বারা যজ্ঞডুমুরকেই বুঝাইতেছে ; সাধারণ ডুমুরের সংস্কৃত নাম কাকোড়ুম্বরিকা (কাক ডুমুর) ফল্গু, মলপূ, জঘনেফলা। উভয়েরই গুণ বলা হইবে।

বিনাফুলেই এই ফল হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত নাম—অপুষ্পফল বা পুষ্পহীন। ডুমুর গাছের গায়ে (কিয়দ্দূর উচ্চে) ফল হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত অন্য নাম—জঘনেফল। হোমকালে ইহার কাষ্ঠের যূপ (দণ্ড বিশেষ) প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত নামান্তর—যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞযোগ্য ও পবিত্রক। লৌকিক সংস্কার আছে যে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, ইহা সত্য কি মিথ্যা ভগবান্ জানেন। তবে বোধ হয়, রাজপদ দুর্লভ বলিয়াই পরস্পর তুলনা দ্বারা এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

উড়ুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
মধুর স্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ॥

যজ্ঞডুমুরের রস—মধুর কষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীতল; গুণ—গুরু, রুক্ষ, কফপিত্তঘ্ন, রক্তরোধক ও রক্ত শোধক, ব্রণ শোধক ও ব্রণ-রোপক। ব্রণশোধক অর্থাৎ ইহার ছালের ক্বাথে ঘা ধুইলে পুঁজ ক্লেদ দূর হইয়া ঘা পরিষ্কার হয়। ব্রণরোপক অর্থাৎ ঘা ক্ষয়যুক্ত বা নিম্নতর হইলে ইহার ছালের রসে ঐ ঘায় মাংস গজাইয়া পূরিয়া আসে। প্রভাব—বর্ণশোধক অর্থাৎ পাকা যজ্ঞডুমুর বা অগ্নিসংস্কৃত কাঁচা যজ্ঞডুমুর খাইলে শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং ছাল বাটিয়া লাগাইলে মেচেতা প্রভৃতি বিবর্ণতাকারী রোগ দূরীভূত হয়।

নির্ঘণ্ট রত্নাকর মতে—উড়ুম্বরঃ প্রমেহঘ্নঃ গর্ভসন্ধানকারকঃ॥

অস্থিসন্ধানকৃদ্ বর্ণ্যং কফপিত্তাতিসারকান্।
যোনিরোগং নাশয়তি বল্কং চৈবাস্য শীতলম্॥
রক্তরুক্ পিত্তদাহ ক্ষুৎ তৃষা শ্রম প্রমেহহৃৎ।
শোষ মূর্চ্ছা বমিধ্বংসি পক্বং ফলং তু কীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ যজ্ঞডুমুরের ফল স্রাবযুক্ত প্রমেহঘ্ন ও গর্ভস্থাপক। ইহার ছাল ভগ্নাস্থি যোজক, বর্ণকর, কফপিত্তাতিসার নাশক, যোনিরোগঘ্ন, এবং শীতল। পক্বফল রক্তদোষহর, পিত্ত দাহ ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম প্রমেহ (জ্বালাযুক্ত) নাশক, এবং ক্ষয় মূর্চ্ছা বমি হারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাকোড়ুম্বরিকা গুণঃ।

কাকোড়ুম্বরিকা ফল্গু র্মলপূঃ র্জঘনেফলা।
মলপূ স্তম্ভকৃৎ তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ।
কফপিত্ত ব্রণ শ্বিত্র কুষ্ঠ পাণ্ড্বর্শঃ কামলাঃ॥

কাকডুমুর কষায় ও ঈষৎতিক্ত রস, রক্তমলমূত্রাদির স্তম্ভকর, কফপিত্তঘ্ন, ব্রণ, ধবল, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শ ও কামলা রোগীর হিতকারী। ইহার তিক্ত ও কষায় রস সত্ত্বেও ইহা প্রভাব বশতঃ শীতল।

প্রয়োগ—ডুমুরের ঔষধীয় শক্তি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে বলা উচিত যে অস্মদ্দেশে ইহা উৎকৃষ্ট তরকারীর মধ্যে গণ্য। পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থের বাড়ীর

অনতিদূরে অযত্ন-জাত অনেক ডুমুরের গাছ দৃষ্ট হয়; দরিদ্র গৃহস্থেরা দিন-বিশেষে পয়সার অনাটনে বাজারে যাইতে না পারিলে ডুমুর ও তৎসঙ্গে অন্য শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া সে দিনের আহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অথবা রুচি উদ্রিক্ত করিবার জন্য অন্যান্য তরকারীর সহিত মধ্যে মধ্যে ইহা রন্ধন করিয়া থাকে। কচি ডুমুর সুখাদ্য, লঘুপাক ও মুখরোচক। সহরের বাজারে দু পয়সায় অল্প চারিটী মিলে, সহরে গরিব ভদ্র বাবুরা তাহাই পাইয়াই চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ, ইহা নির্দ্দোষ ও উপকারী বলিয়া রোগীর পথ্য রূপে প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য সহরের বাজারে ইহার একটু আদর ও টানাটানি লক্ষিত হয়। তরকারী রূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে যজ্ঞডুমুর অপেক্ষা ছোট ডুমুরই ভাল। ইহা ভাজা, ঘণ্ট, ছেঁচ্‌কি, মাছের ঝোল বা নিরামিষ ব্যঞ্জন, প্রভৃতি যাহার উপকরণেই প্রযুক্ত হউক, সর্ব্বরূপেই সুস্বাদু হইয়া থাকে। ঔষধাকারে যজ্ঞডুমুরের প্রয়োগই কবিরাজ মণ্ডলী মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু যজ্ঞডুমুরের কাজ ছোটডুমুরেও যে না হয় এমন নয়, বরং রোগবিশেষে এই ডুমুরেই অধিক ফল হয়। উভয় ডুমুরই কষায়রস ও ধারক, প্রধানতঃ এই গুণেই কতিপয় রোগে ডুমুরের ব্যবহার; কিন্তু ছোট ডুমুরের কষায়ত্বের সহিত ঈষৎ তিক্তের আমেজ আছে, অতএব মেহ প্রভৃতি রোগে চোখ বুজিয়া বাঁধা-নিয়মে শুধুই যজ্ঞডুমুরের রস ব্যবহার না করিয়া অবস্থা বিশেষে ছোট ডুমুরও প্রয়োগ করা উচিত। মনে করুন্, যদি মেহাদি রোগের সহিত জীর্ণজ্বর, কাস, পাণ্ডু, চর্ম্মরোগ, যকৃদ্দুষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, তবে নিশ্চয়ই যজ্ঞডুমুরের রস অপেক্ষা সাধারণ ডুমুরের রসেই অধিক উপকারের সম্ভাবনা।

মেহ, বহুমূত্র, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর রোগে যজ্ঞডুমুর উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবিরাজগণ উক্ত রোগ সমুদায়ে রোগীকে যজ্ঞডুমুর পথ্যস্বরূপ ব্যবস্থা দেন; এবং ব্যবস্থেয় বটিকা চূর্ণাদি ঔষধের অনুপানার্থ যজ্ঞডুমুরের রস ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ ডুমুর যখন যে ভাবেই ব্যবহার করুন, উপকার পাইয়া থাকেন। ইহা তাঁহারা ছাল ও বীজ ফেলিয়া চাকা-চাকা করিয়া কাটিয়া মিশ্রির গুঁড়া সহ স্নানান্তে জল খাবার করিতে পারেন; ভাতে দিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া, ঝোলে, তরকারীতে—নানারূপে ব্যবহার করিতে পারেন। যজ্ঞডুমুরের মোরব্বাও

হইয়া থাকে ; ইহা বড় সুস্বাদু, কিন্তু প্রস্তুত করিবার সময়ে ইহার রস নিংড়াইয়া ফেলা হয় বলিয়া ইহা কিঞ্চিৎ হীনগুণ হইয়া থাকে।

যজ্ঞডুমুরের হালুয়া—বড় উপকারী, ইহা প্রস্তুত করিবার বিধি এই,—যজ্ঞডুমুর অপক্ক অবস্থায় ফিঁকে-সবুজ থাকে, পাকিবার অগ্রে (ডাঁসা অবস্থায়) আরো ফিঁকে ও একটু হরিদ্রাভ হয়। ঐরূপ ডাঁসা যজ্ঞডুমুর সংগ্রহ করিয়া ছেঁচিয়া বা কাটিয়া বীজ ফেলিয়া দিবে, এবং কিয়ৎক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ ডুমুর উঠাইয়া শিলায় উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে ; উননে কড়াই চড়াইয়া তাহাতে গব্যঘৃত দিয়া এই বাটা ডুমুর কিয়ৎ পরিমাণে ভাজিয়া লইয়া, একটু রস টানিয়া গেলে উহাতে ছাগদুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে—পরে পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া এবং ছোটএলাচ, তেজপত্র ও দারুচিনির অল্প গুঁড়া দিয়া পুনরায় নাড়িতে নাড়িতে 'থস্‌থসে' মত হইলে নামাইয়া রাখিবে ; শীতল হইলে খাওয়া উচিত। প্রতিদিন নূতন করিয়া প্রস্তুত করা ভাল ; একটু কড়া-পাক করিলে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে গুণের হানি হয় না। এই হালুয়া ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র ও ক্ষয়রোগীর পক্ষে অমৃতবৎ। প্রতিদিন বৈকালে অন্য 'জলখাবার' পরিবর্ত্তে এই হালুয়া আহার কর্ত্তব্য।

যজ্ঞডুমুরের সরবৎ—যজ্ঞডুমুর পাকিলে সুন্দর লালবর্ণ ও মিষ্টাস্বাদ হয়। ইহার একটা দোষ এই যে, পাকিবার দুএকদিন পরেই উহার মধ্যে পোকা জন্মে, সুতরাং টাট্‌কা-পাকা যজ্ঞডুমুর সংগ্রহ করিতে হয়। অতিপক্ক ডুমুরের পোকা ফেলিয়া দিয়া লইলেও হানি নাই (এ পোকা বিষাক্ত নয়, তবে ঘৃণা বলিয়া অনেকের অরুচিকর হয়।) পাকাডুমুর বেশ নরম হয়, বীজ ফেলিয়া দিয়া একটা প্রস্তর পাত্রে উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া উহাতে ছানার জল বা ঘোল দিয়া গুলিবে ; পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ইহাতে অল্প কেওড়ার জল বা গোলাপজল দিতে হয়। এই সরবৎ বায়ুপিত্ত অজীর্ণ ও রক্তপিত্ত রোগীর বিশেষ উপকারী। গরমের দিনে সহজ শরীরে এই সরবৎ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে। পশ্চিমদেশে বাজারে খুব বড় বড় পাকা যজ্ঞডুমুর বিক্রীত হয়, তথায় এই সরবতের বড় আদর। শুধু পাকা যজ্ঞডুমুরের রস একটু মধু মিশাইয়া খাইলে রক্তপিত্তরোগীর সমধিক উপকার হয়।

(১) যজ্ঞডুমুরের মূলের ছাল ছেঁচিয়া তাহার রস ১ কাঁচ্চা ও যজ্ঞডুমুরের

শুষ্ক বীজ চূর্ণ ৵০ আনা একত্রে দিনে ৩ বার সেবন করিলে মেহের সূত্রবৎ-স্রাব ও মূত্রাধিক্য এবং স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর আরোগ্য হয়। (২) যজ্ঞ-ডুমুরের ছালের কাথে যোনি ধৌত করিলে, তত্রত্য ক্ষত আরোগ্য হয়; শরীরের অন্যস্থানের ক্ষতেও এই ধৌতি উপকারী। (৩) ডাঃ য়্যাট্‌কিন্‌সন বলেন "ইহার পাতার উপরে যে মসূরের মত উদ্গম হয়, তাহা বাটিয়া দিলে বসন্তরোগের ব্রণ গভীর ও দূষিত হইতে পারে না।" (৪) তিল-তৈলের সঙ্গে যজ্ঞডুমুরের আঠা ফেনাইয়া দিলে পোড়া-ঘা সারে। (৫) ম্যাকান সাহেব বলেন—"ডুমুর গাছে অনেক সময় লাক্ষাকীট অবস্থিতি করে।" এই গাছের লাক্ষা রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মায় ফলপ্রদ। যজ্ঞডুমুরের আঠায় পাখী ধরিবার একপ্রকার আঠা প্রস্তুত হয়।

রক্তপিত্তরোগের 'উশীরাসব' বহুমূত্রের 'কদল্যাদি ঘৃত' ও প্রসিদ্ধ অমৃত-প্রাশ ঘৃত, প্রভৃতি ঔষধে যজ্ঞডুমুর আবশ্যক হয়।

এরণ্ড।

বাঙ্গালা—রেড়ী বা ভ্যারাণ্ডা; হিন্দী—রেঢ়ী; ইংরাজী—Castor oil plant. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ। বাতারি স্তরুণশ্চাপি রুবূকশ্চ নিগদ্যতে। রক্তোঽপরো রুবূকঃ স্যাদুরুবূকো রুবুস্তথা। ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারি শ্চঞ্চু রুত্তানপত্রকঃ। সংস্কৃত নাম—শুক্ল এরণ্ড, আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, বাতারি, তরুণ, রুবূক; (অপর) রক্ত এরণ্ড, রুবূক, উরুবূক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু, উত্তানপত্রক। এরণ্ডের অন্যান্য নাম—ত্রিপুটী ফল, পঞ্চাঙ্গুল, শূলশত্রু, বর্দ্ধমান, কান্ত, চিত্রবীজ, ইষ্ট, স্নেহপ্রদ।

এরণ্ড গাছ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহা মানুষের মত উচ্চ, স্থান বিশেষে, মানুষের দেড়গুণ বা দ্বিগুণ উচ্চ হয়। পাতা মানুষের হাতের থাবার মত, পাঁচ ছয়টা শির বাহির করা, ঐ শির যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে ক্রমে সরু হওয়ায় পাতার চেহারা খাঁজ-কাটামত। ইহার গুঁড়ী-কাঠ দু তিন অঙ্গুলী মোটা ও বড় হালকা, ডালগুলি ফাঁপা; এই বৃক্ষকে সংস্কৃতকবিরা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাই এই উক্তি—"নিরস্ত-পাদপেদেশে এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে" অর্থাৎ যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে রেড়ী-

গাছও গাছ বলিয়া গণ্য হয়। এরণ্ড গাছ, শাদা ও লালভেদে দুই প্রকারের আছে, লালগাছগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, গাছ ঘোর লালবর্ণ নহে, কেবল লালের আভাযুক্ত। দুইএর গুণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

শ্বেত এরণ্ডের গুণ।

শ্বেতোরুবূকঃ কটুক স্তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণো গুরু স্তথা।
মধুর স্তিক্তকো বৃষ্যো স্বাদুপাকঃ সরঃ স্মৃতঃ॥
বাতোদাবর্ত্তকফহৃৎ জ্বরকাসোদরাপহঃ।
শোথশূল কটীবস্তি শিরোরুগ্ নাশনঃ স্মৃতঃ॥
শ্বাসানাহ কুষ্ঠ ব্রধ্ন গুল্ম প্লীহামপিত্তহা।
প্রমেহোষ্ণবাতরক্ত মেদোঽন্ত্রবর্দ্ধন প্রণুৎ॥

শ্বেত এরণ্ডের রস—কটু-মধুর-তিক্ত; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—তীক্ষ্ণ, গুরু, বায়ুনাশক, উদাবর্ত্ত (বায়ুতে পেটের ভিতর উর্দ্ধ-দিক্ টানিয়া রাখা, যাহাতে কিছুতে বাহ্যে প্রস্রাব হয় না), কফহর, জ্বর, কাস, উদর রোগ, শোথ ও শূল প্রশমক, কটী, বস্তি ও মস্তকের ব্যথা নাশক; শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ, ব্রধ্ন, গুল্ম, প্লীহা ও আমঘ্ন (সঞ্চিত আম নিকাশিত করে) পিত্তনাশক, উষ্ণতা (দেহের জ্বালা বা উত্তাপ) নিবারক, বাতরক্ত, মেদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি হারক। প্রভাব—প্রমেহ নাশক, বৃষ্য।

রক্ত এরণ্ডের গুণ।

রক্তোরুবূক স্তবরো রসে কটুর্লঘুঃ স্মৃতঃ।
তিক্তো বাত কফ শ্বাস কাস ক্রিম্যর্শো ব্রধ্নহা॥
রক্তদোষ পাণ্ডুরুক্ ভ্রান্ত্যরোচক নাশনঃ।
প্রাঃস্বস্থে গুণাশ্চান্ত শ্বেতবচ্চ সমীরিতাঃ॥

রক্ত এরণ্ডের রস—কটু-তিক্ত-কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—লঘু, বাতকফহর; শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অর্শ ও ব্রধ্ন নাশক, রক্তদোষ, পাণ্ডুরোগ ও অরুচি হারক; শ্বেত এরণ্ডের অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে; প্রভাব—ভ্রান্তি (ভ্রমী বা শিরোঘূর্ণন) নিবারক।

স্ত্রীজাতির গুণ।

আমরা কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির কতকগুলি দোষ ঋষির পাঠিকাগণকে দেখাইয়াছি, এক্ষণে স্ত্রীজাতির কতকগুলি গুণ পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীজাতির গুণ গুলি অতুল্য, এই অমূল্য গুণাবলীতে অলঙ্কৃতা বলিয়াই হিন্দু-সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া। কিন্তু পূর্ব্বে যে দোষগুলি দেখাইয়াছি, তাহাও বড় ভয়ানক। সেই দোষ গুলির জন্যই অনেক-সংসারে স্ত্রীজাতিকে দেবীর পরিবর্ত্তে প্রেতিনীরূপে দেখিতে পাই। সেই দোষ গুলি সংশোধিত করিয়া রমণী যাহাতে নিজ দেবীনামের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সকল রমণীরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখান যাউক স্ত্রীজাতিতে কি আছে।—

যে অমূল্য প্রেম রত্নের শীতলস্পর্শে জীব জুড়ায়, ধন্য হয়, হিন্দুরা যাহাকে বলেন "যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর" সেই পবিত্র প্রেমরত্নের আবাস-ভূমি রমণী হৃদয়। রমণী-হৃদয় প্রেমের প্রস্রবণ, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতি সাজিয়া জীবকে শ্রীভগবৎ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। এ জগতে স্ত্রীজাতি না থাকিলে কেহই প্রেমের পবিত্র সম্মিলনানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন না। উহা কবির কল্পনায় পরিণত হইত মাত্র। স্ত্রীহৃদয় স্বর্গীয় আলোকে প্রভাসিত। লম্পট সুরাপায়ী পতি, অবিরত অনাদর অপমান লাঞ্ছনা যন্ত্রণায় সরলা সহধর্ম্মিণীর হৃদয় ভাঙিয়া দিতেছেন, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বারবিলাসিনীর চরণ রূপ মহাবৈতরণী পার হইতেছেন, তবুও স্ত্রীজাতি সর্ব্বজন-ঘৃণ্য সেই স্বামীকে অশ্রদ্ধা করেন না। তবুও সেই মুখখানি চাহিয়া তাঁহারা আত্মহারা হন। সেই কুক্রিয়াসক্ত পতির একটু মাথা ধরিলে, তাঁহারা জগত অন্ধকারময় দেখেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য কত দেব দেবীর নিকট প্রতিনিয়ত মাথা কুটিতে থাকেন। স্ত্রীজাতি সর্ব্বাবস্থাতেই জানেন "পতিরেক গতিঃ সদা"।

সন্তান পালন স্ত্রীজাতির একটি বিশেষ গুণ। সন্তানের মঙ্গলার্থে স্ত্রীজাতি না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্যই নাই। কুক্রিয়াসক্ত পুত্রের চরিতে বিরক্ত হইয়া পিতা পুত্রকে নানারূপ নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন, সেই পুত্র-

কেই স্নেহময়ী জননী "যাদুধন" বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়া রমণী হৃদয়ের অসীম স্নেহবত্তা দেখাইয়া, দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করেন। সন্তানের কিঞ্চিন্মাত্র পীড়ার সঞ্চার হইলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পীড়িতের শিরোদেশে বসিয়া অনবরত শুশ্রূষা করিতে একমাত্র জননীই সক্ষম। জননী আছেন বলিয়াই জগত পালন হইতেছে, বলিতে গেলে জননী জগদ্ধাত্রী-স্বরূপা। এই জন্যই "মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী"। যে মাতা জগদ্ধাত্রী স্বরূপা সেই মাতা স্ত্রীজাতি। সুতরাং বলিতে হয় স্ত্রীজাতির গুণেই বিশ্বময়ের বিশ্বরাজ্য চলিতেছে।

আধুনিক কর্ত্তারা ভৃত্যবর্গকে কুক্কুর বা তদপেক্ষা কোনও নিকৃষ্ট জীব বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু গৃহিণীরা ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে দাসদাসী-গণকে প্রতিপালন করেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে মাতার ন্যায় স্নেহদান করিয়া তাহাদিগের যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দেন; স্ত্রীজাতির স্নেহ কারুণ্যেই তাহারা তীব্র পরাধীনতা-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরগৃহ বাস করিতে সমর্থ হয়।

দ্বারে অতিথি উপস্থিত হইলে কর্ত্তাদিগের ব্যবস্থায় অনেক স্থলে মুষ্টির বদলে যষ্টির ব্যবস্থাও হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীজাতি কত আদর যত্নের সহিত অতিথির সন্তোষ বিধান করেন। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ অতিথি সেবার আদেশ দিয়াছেন, স্ত্রীজাতিও বলেন "অতিথি রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হয়"। রমণীজাতির ধর্ম্মপ্রাণতাই আজিও হিন্দুধর্ম্মকে জীবিত রাখিয়াছে। আজিও যে হিন্দু-সংসারে অতিথি সেবা, ভগবৎ সেবা, গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও কারণ স্ত্রীজাতির গুণ। ধর্ম্মপ্রাণতাই সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। যে হৃদয় ধর্ম্মভাবহীন সে হৃদয় নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষাও ঘৃণিত। ঘোর স্বেচ্ছা-চারী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা হইতেই সমাজে অশান্তি-অনল ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিয়া পরিণামে সেই অনলে সকলে দগ্ধ হয়। নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজের ইষ্টানিষ্টের দিকে চাহিয়া দেখিবার বড় একটা সময় পান না, তাঁহারা পাশ্চাত্য রীতিনীতি অনুকরণের জন্য স্বতঃই ব্যস্ত। প্রত্যেক প্রদেশের রুচি ও রীতি-নীতি বিভিন্ন। এক দেশে যে আহার্য্য স্বাস্থ্যকর, অন্য দেশে তাহাই অস্বাস্থ্য-কর হইতে দেখা গিয়াছে, এইরূপ প্রতিকার্য্যেই এক দেশের সহিত অন্য দেশের বিভিন্নতা আছে ও তাহা থাকা স্বভাবসিদ্ধ তাহা কেহ বুঝেন না। তাঁহারা কিরূপে বিধবা বিবাহ ও যৌবন বিবাহ প্রচলিত করিবেন, সেই

চিন্তাতে তাঁহারা সর্ব্বদা জর্জ্জরিত। এখনও ক্বচিৎ "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নব বর্ষে চ রোহিণী" যে দেখা যায় তাহা স্ত্রীজাতির ধর্ম্মপ্রাণতারই পরিচয় মাত্র। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্ত্রীজাতির হস্তে স্বাধীনতার জয়পতাকা তুলিয়া দিয়া কিরূপে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বদা সেই চিন্তাতে অস্থির। তাঁহাদের কল্পনা যতই কার্য্যে পরিণত হইতেছে, সমাজ ততই অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও স্ত্রীজাতির গুণেই এখনও হিন্দুসমাজ টিকিয়া আছে। বায়ুবিতাড়িত তরণীর নাবিকের ন্যায় এখনও ধর্ম্মপ্রাণতা রজ্জু দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল সমাজরূপ মত্ত হস্তীকে স্ত্রীজাতি, অতি সতর্কতার সহিত ধরিয়া আছেন। এখনও যে দীন দরিদ্র-পালন, ব্রাহ্মণসজ্জনদিগকে দান, কাশী শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন হইতেছে তাহাও স্ত্রীজাতির গুণ। এই ঘোর বিপ্লবের সময়ও স্ত্রীজাতির গুণেই এখনও মানবহৃদয়ে ধর্ম্মের ছায়া নিপতিত রহিয়াছে।

কোনও ইংরাজ মহাপুরুষ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "স্ত্রীলোক ধীরভাবে প্রত্যহ যে যন্ত্রণা সহ্য করে, পুরুষদিগকে যদি তাহার শতাংশের একাংশ সহ্য করিতে হইত, তবে তাঁহারা পাগল হইয়া যাইতেন। তাহারা অবিশ্রান্ত-দাসত্বের কোন পুরস্কার পায় না। অবিচল ধীরতা, সহৃদয়তার বিনিময়ে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ব্যবহারই লাভ করে। তাহাদের ভালবাসা, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সতর্কতা, এমন কি একটা ভাল কথার দ্বারাও স্বীকৃত হয় না। কত স্ত্রীলোক এই সকল স্থির ভাবে সহ্য করে এবং বাহিরে প্রফুল্ল ভাব দেখায় যেন তাহাদের প্রাণে কোনই কষ্ট নাই"। বস্তুতঃ এবম্বিধাচরণ একমাত্র স্ত্রীজাতিতেই সম্ভবে।

দয়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, ঈশ্বরে প্রীতি, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি মহাত্ গুণাবলীর, স্ত্রীহৃদয়ে যেরূপ একাধিপত্য সেরূপ আর কোথাও নাই। অনেক স্থলে দেখা যায় কোন দীন খাতক বা প্রজা তাহাদের দেয় প্রদান করিতে না পারিয়া খাতক বা জমীদারের কোপানলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার শেষ সীমার উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে সেই বাটীর গৃহিণীর অনুকম্পাতেই সে দায় উদ্ধার হইয়াছে।

কোন শত্রুপক্ষের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, রমণী আপনা সকিত শত্রুতা

বিস্মৃত হইয়া দিনে দশ বার খবর লইয়া থাকেন। পীড়িতের সেবা করিতে স্ত্রীজাতি স্বতঃই মুক্তপ্রাণ। এমন কি যাহার সহিত কখনও পরিচয় নাই ঈদৃশ দীন বৃক্ষতল-শায়ী পীড়িত-পথিকের নিকট স্ত্রীজাতিকে সুশীতল পানীয়-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্র বলেন "শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ"। যে সংসারে স্ত্রী নাই সে সংসার কত বিশৃঙ্খলাময় তাহা বোধ হয় সহজেই সকলে অনুমান করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষা বলে দেবীবৎ এই অমূল্য হৃদয় খানিও পুরুষের কঠিন চরিত্রানুকরণ করিয়া কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছে। আমাদের বিনীত নিবেদন, ভগিনীগণ! বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণ না করিয়া, প্রাচীনা আর্য্য-মহিলাগণের চরিত্রানুকরণে যত্নবতী হও, তাহা হইলে আবার ভারত-ভাগ্যে সৌভাগ্যরবি উদিত হইয়া তাহাকে প্রভাসিত করিবে, ভারত আবার সীতা-সাবিত্রীর ছবি অঙ্কে লইয়া ধন্য হইবে। নিজ ভাণ্ডারে রত্ন থাকিতে পর দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাওয়া নিশ্চয়ই ঘৃণা ও মূর্খতার বিষয়। হিন্দু সংসারে রমণীই "শ্রী", (লক্ষ্মী) এই জন্যই হিন্দু সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া। রমণীর আদর হিন্দুজাতি যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কোনও সমাজে কোনও জাতির মধ্যে কেহই বুঝেন নাই। তাই বলি ভগিনীগণ এ হেন অতুল্য গুণরাশি নষ্ট করিয়া নিজের গৌরব হারাইও না। নিজ নিজ দোষগুলির সংশোধন পূর্ব্বক গুণরাশির বিকাশ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল কর!!!

মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথা রচয়িত্রী—বোলপুর।

পতি-দেবতা। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলে রমণীরা বুঝে যে, "স্ত্রীলোকও মানুষ, আর পুরুষও মানুষ, তাহারা উভয়েই এক ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী, অথচ কেবল পুরুষেরাই যে সকল পার্থিব সুখ ভোগ করিবে আর তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া পুরুষের সুখ দুঃখের উপর নিজ সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকিবে ইহা কখনই পরম কারুণিক সমদর্শী জগৎপিতার অভিপ্রায় হইতে পারে না।" পুরুষগুলা তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া দমনে রাখিবার জন্যই এইরূপ একটা নিয়ম করিয়া লইয়াছে, অতএব একেবারে "ভাতারের দাসী

হয়ে থাকা কি পোষায়” এখন তাহারা বুঝিয়াছে—স্বামিও যা’ স্ত্রীও তা’। এখন তাহারা স্বামীকে কি নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে পারে? না, স্বামীর হুকুমটীর অপেক্ষা করিয়া যাত্রা মহোৎসব না দেখিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে পারে? আর যাত্রামহোৎসব দেখিলেই কি স্ত্রীলোকের সব যায়? স্ত্রীলোক কি এতই হতভাগা জাত? স্বামীর কথায় উত্তর না দিয়া কি এখন মেয়েরা থাকিতে পারে? এখনকার কালে কি আর তা চলে? সেকালের মাগীগুলা দাঁতে মিসি, নাকে নথ, পায়ে আল্‌তা, ৫ ছেলের মা হ’লেও মাথায় এক হাত ঘোমটা দিত, কাজেই তাহাদের পক্ষে ও সকল শোভা পাইত, কিন্তু এখনকার কালে তা’ চলে কি? এখন এরা শিখ্‌ছে যে দম্পতী একটী বোঁটায় দুটি ফুল, তাহাদের মধ্যে আবার উচ্চ নীচ কি, সম্ভ্রম অসম্ভ্রম কি? একজনের উপর আর একজন প্রভুত্ব করিবে, আর একজন নীরবে তাহা সহিয়া যাইবে, তাহা হইলে কি একপ্রাণতা জন্মে?

যেখানে ভয় ও মান্যের সম্বন্ধ, গুরুজনের ন্যায় ব্যবহার, সেখানে কি ভালবাসা—প্রাণে প্রাণে মিশামিশি ভালবাসা—দাঁড়াইতে পায়? বরং উভয়ে উভয়কে সমান চক্ষে দেখিয়া সমান ভাবে চলিতে পারিলে সমানভাবে দুজনে দুজনের ভালবাসা পাইবে। স্বামী রাগিয়া তাড়না করিলেও স্ত্রীতে কথা কহিতে পাইবে না, এরূপ একটা পক্ষপাতপূর্ণ নিয়ম সেকালে ছিল, আর মাগীগুলার জ্ঞানবুদ্ধি থাকিতে তাহাই মানিয়া চলিত, এ কথা এখন কেহ বিশ্বাসই করিতে পারে না। স্বামী স্বচ্ছন্দে ন্যায় অন্যায় দু কথা বলিয়া যাইবে আর স্ত্রীলোকে রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাই সহ্য করিয়া থাকিবে, এ কি হয়! দুটা মুখের কথা কহিয়া স্বামীকে বুঝাইবে না, কি নিজের নির্দ্দোষিতা দেখাইয়া দিবে না? সেকালে নিয়ম ছিল, পতি দোষ করিলেও পতিকে কিছু বলিতে পাইবে না, যদি পতির অত্যাচার সহ্য করিতে অশক্তা হয়, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিবে তবু পতিকে কিছু বলিতে পাইবে না।—এখন এ শিক্ষা কোথায়? এখনকার কালে এ শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষকই বা কোথায়—এ রকম আজগুবি নিয়ম যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, আর লোকে তাহা পালন করিত, তাহা হয় ত এখন মাথা কুটিয়া ফেলিলেও কোন রমণীর ধারণাই হইবে না।—এখন ইহা বলিতে

শিখিয়াছে, বাপ্ রে! অমন স্বামী মাথায় থাকুন, আমার কাজনেই স্বামীর ভাত খেয়ে! জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।—ইত্যাদি।—অবশ্য একালে যে সকলেই এরূপ করে, এমন নয়; তবে শিক্ষার দোষে অধিকাংশের প্রাণে স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ও স্বাবলম্বনের ভাব বেশী জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা ঠিক।

সেকালের রমণীরা কিরূপে "পতি-দেবতা"র শুশ্রূষা করিতেন ও তাহার ফল কতটা আশা করিতেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

নারদ যমকে পতিব্রতার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করায়, যম বলিতেছেন "হে বিপ্র! হে মহামতে! পতিব্রতা নারীর নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, দান ও দম নাই (অর্থাৎ স্বামীসেবাই তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ের ফল দিয়া থাকে।) হে বিপ্র! পতিব্রতা নারী যেরূপ ব্যবহার-যুক্তা হইয়া থাকেন, তাহা শুন।—পতিব্রতা, স্বামী নিদ্রা গেলে পর নিজে নিদ্রা যান, স্বামী জাগিলেই জাগরিতা হন, স্বামীকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে ভোজন করেন, কাজেই তিনি যমকে জয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার যমযাতনা হয় না। পতি নিস্তব্ধ থাকিলে পতিব্রতা নিজে কথা কহেন না; স্বামী থাকিলে, তিনি থাকেন; হে বিপ্র! কাজেই তিনি যম জয় করিয়া থাকেন, নারীগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যমযাতনা এড়াইবার সহজ উপায় আর কিছু দেখিতেছি না। পতি-ব্রতা রমণী (পুরুষের মধ্যে) পতিকেই দর্শন করেন, পতিতেই তাঁহার মন নিযুক্ত থাকে ও পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন, হে তপোধন! আমরা এইরূপ পতিব্রতাকে ভয় করিয়া থাকি, অন্য সকলেও ভয় করে; এরূপ পরম শোভনা সাধ্বী, দেবতাগণেরও পূজ্যা। পতি যদি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে পতিব্রতাকামিনী প্রণতি পূর্ব্বক (নম্রভাবে) তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। হে বিপ্রেন্দ্র! পতিব্রতারমণী যদি পতির নিকটে থাকিয়াও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন তবুও তিনি পতিকেই আশ্রয়-করিয়া থাকেন কখনও অন্যকে আশ্রয় করেন না। পতিব্রতারমণী একান্ত ভক্তিতে স্বামীর অনুগতা থাকেন, কাজেই হে ব্রহ্মনন্দন! তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। এইরূপে যে রমণী পতিশুশ্রূষা করিয়া থাকেন তিনি আমাকে জয় করিয়া থাকেন, আর তাঁহার নিকট আমাকেও কৃতাঞ্জলি হইয়া

থাকিতে হয়। যে রমণী স্বামীকে ধ্যান করেন, তাঁহার অনুগতা থাকেন, এবং তাঁহার বিষয়ই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা (পতি কথা বা পতি রূপ ব্যতীত) গীত, বাদ্য নৃত্য ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু শুনেন না বা দেখেন না সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা রমণী যখন স্নান করেন, কেশসংস্কার করেন বা অন্য কর্ম্মে নিযুক্তা থাকেন, তখনও মনে মনে অন্যের কথা চিন্তা করেন না। দেবতার্চ্চনকালে বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সময়েও পতিব্রতারমণী পতিকে চিত্ত বহির্ভূত করেন না সুতরাং তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে তপোধন! যে নারী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহ-মার্জ্জনা করেন তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে রমণীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সংযত হয় অর্থাৎ যাহার চক্ষু পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে দেখেনা, যাহার দেহ পতিভিন্ন অন্যপুরুষে দেখিতে পায় না ও যাহার স্বভাব পতি-ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না সে সদাচারিণী রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না। যে নারী পতিরই মুখ দেখিয়া থাকেন (অপরের দেখেন না), পতির মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্তা থাকেন তাঁহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে বিপ্র! পতিব্রতার এই সকল কার্য্য কলাপ ও নিয়মাদি আমি পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম এক্ষণে সেই গোপনীয় পতিব্রতা চরিত তোমাকে কহিলাম সকল ধর্ম্মাপেক্ষা রমণীর পক্ষে এই পাতিব্রত্যধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পতিব্রতাকে দেখিলেই পূজা করি।"

এইত স্বয়ং যমের কথা। এ কথায় বিশ্বাস না করিবার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না কিন্তু বিশ্বাস করিবার কারণই যথেষ্ট আছে, কারণ যিনি যমালয়ের অধিশ্বর নরকাদি দণ্ডদাতা তিনিই স্বয়ং নারদকে বলিতেছেন যে এই সকল কার্য্য করিলে রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না—ইহা অপেক্ষা অভয় বাক্য আর কি হইতে পারে? সেকালের রমণীরা বুঝিত, এ কথায় বিশ্বাস করিত কাজেই তাহারা এরূপ কার্য্য করিয়া হিন্দুর সংসার সুখের-সংসার করিয়া তুলিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

সদাই মনে রেখো।

নাকে ছুঁইয়ে কোনো ফুল উচিত নয়কো শোঁকা।
নাকের ভিতর ঢুক্‌তে পারে ফুলের মাঝের পোকা॥
মুখের থুতু দিয়ে বইয়ের উল্টাইওনা পাতা।
অজানা বিষ থাক্‌লে কিছু বড়ই ভয়ের কথা॥
ছুরী কাঁচি কথার ভুলেঃদিওনাক মুখে।
কাণে কাটী দিবার সময় যায়না যেন ঢুকে॥
পরের বাড়ী যেতে দেখো চৌকাট্ উঁচু নীচু।
অজানা পথ যেতে হলে যাওয়া ভাল পিছু॥
ভিজা বস্ত্রে অনেকক্ষণ থেকো নাক বসে।
নিমন্ত্রণের বাড়ী কভু খেয়োনাক ঠেসে॥
গাড়ী হতে নামিবে বা উঠিবে যখন।
দেখো যেন নাহি ঘটে দৈব দুর্ঘটন॥
খেতে বসে হলে পরে অধিক অন্তমনা।
বিষম্ লেগে কষ্ট পাবে স্বাদও বুঝিবে না॥
শোবার আগে বিছানাটী ভাল করে দেখো,—
চট্ করে চিৎ হওয়া দোষ সদাই মনে রেখো॥

অগ্নি পরীক্ষা।

দূরে ওই কে সতী রমণী, পতি পাশে দাঁড়া'য়ে নীরবে?
বিনত কপোল-পরে, শত আঁখি-নীর ঝরে,
হৃদয়ের ব্যথা কত, অবলা কেমনে ক'বে!

চারিদিকে জনতা প্রচুর, দূরে রহে বাহক-শিবিকা,
সম্মুখে দেবর-পতি; চিন্তায় আকুল সতী,
হৃদয়ে নিরাশ-বহ্নি দেখাই'ছে প্রহেলিকা!

পতি-মুখে, জনক-দুহিতা, ভীম রব শুনিলা আবার,—
"রাক্ষস-আবাসে রহি, এতকাল গেল বহি',
বুঝাও কেমনে, সীতা! বহিলে সতীত্ব-ভার?

"কহ এবে, নাশিতে সংশয়, আছে তব কোন্ নিদর্শন?
নাহি পারো—যাও ফিরে, মিছে ভাস অশ্রু-নীরে,
করিওনা মায়া-মোহে, আর তিক্ত এজীবন।"

সেই বাণী বজ্রনাদ সম, মৈথিলীর পশিল মরমে;
কাতর সরলা বালা, নিরাশায় বাড়ে জ্বালা;
স্তব্ধ যত সভাসদ, শোক-অশ্রু সমাগমে।

কহিলেন রঘুপতি পুনঃ— "বৃথা বহ কি চিন্তা হৃদয়ে?—
নাহি যদি নিদর্শন, মিছে অশ্রু বিসর্জ্জন,
অনলে পরীক্ষা দেহ, নহে তা'র বিনিময়ে!

"ওই জ্বলে বিকাশি' রসনা, বহ্নিরাশি অনন্ত হুতাশে,
পরীক্ষার স্থল সীতা, তব তরে ওই চিতা;
আজি তব ভাগ্য-লিপি গ্রথিত, অনল পাশে!"

শুনি, বাণী এহেন কঠোর, রহে সবে নীরব-বিষাদে,
কি তীব্র বিষাদ-রেখা, চারিদিকে যায় দেখা,
সবারি হৃদয়ে ভীতি, কি দারুণ অবসাদে!

এ পরীক্ষা নহে ত কখন, রাম-চিত্ত বিনোদন-তরে;
নহে কভু জানকীর এ পরীক্ষা, জানি স্থির,
আজি এ পরীক্ষা শুধু, শিখাইতে চরাচরে;

দেখাইতে জগত-সাক্ষাতে, সতীত্বের প্রভাব-মহিমা;
তাই, ত্যজি, অশ্রু-নীরে, যান সতী ধীরে ধীরে,
প্রদীপ্ত সে চিন্তা-পাশে,— হৃদে প্রীতি-মধুরিমা।

স্বামী-পদ সেবিতে যতনে, যেইমত অযোধ্যা নগরী—
শূন্য ক'রি হাসি মুখে, আসিলা মনের সুখে,
দুঃখময় বনবাসে, পতি-পদ বুকে স্মরি ;

আজো সতী তেমনি আহ্লাদে, হৃদে ল'য়ে তেমনি উল্লাস,
সেই হাসিটুকু নিয়ে, পতি-পদ রাখি' হিয়ে,
পশিলা অনল-মাঝে ; সবে করে হা হুতাশ !

জ্বলে বহ্নি প্রচণ্ড হুতাশে, শিখা উঠে ভেদিয়া গগন !—
সীতা তার মাঝে থাকি, অমরের কীর্ত্তি মাখি',
রাখিলা সতীত্ব নাম, উজলিতে ত্রিভুবন।

রঘুপতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, সমাদরে দিলা তারে স্থান ;
সতী-পূত পদ-পাশে, চারিদিক হ'তে আসে,
ভকতি-অঞ্জলি-রাশি, হইতে ভকত-প্রাণ।

জগতের প্রতি থরে থরে, তাই প্রতি হৃদয়ের তলে,
আদিত্য-কিরণ-মত, সতীত্বের রশ্মি শত,
আজো গো উজলে ধরা, আজো রহে মর্ম্মস্থলে।

আজো শুনি তাই শত মুখে, সতীত্বের মহিমা প্রচুর।
স্মৃতি-পথ দিয়ে যেতে, সতী-গাথা মরমেতে,
কে যেন শুনায় আজো দূর হ'তে কি মধুর !
বাঁচে হেথা' আজো তাই প্রেমিক-পিপাসাতুর !!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

ঋষি।

১ম বর্ষের সূচীপত্র।

(১৩০৫ সালের আষাঢ় হইতে ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত)

ঋষির ১ম বর্ষের সূচীপত্র।

REG: No. C, 87.

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲। আগষ্ট। ১৩০৬, ভাদ্র।

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার (অনূ্যন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵॰।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটীর উল্লেখ করিবেন।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। } { ১৩০৬ ভাদ্র। আগষ্ট। ১৮৯৯

বিবিধ সংবাদ।

গুণের সম্মান।

স্ত্রী। হ্যাঁগা! আজকাল যে প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই একটী যুবকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই, উনি কে?

স্বামী। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে, উনি বোম্বাই দেশীয় একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, বিলাত গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া তথাকার র‍্যাংলার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন; এমন গুণগ্রামের পরিচয় অদ্যাবধি কোনও ভারতবাসীই বিলাত গিয়া দেখাইতে পারেন নাই। তাই চতুর্দ্দিকে এরূপ প্রশংসাধ্বনি উঠিয়াছে।

স্ত্রী। সে পরীক্ষায় কি সাহেবের ছেলেরাও প্রার্থী ছিল?

স্বামী। ছিল বৈকি? সাহেব ই ত সব?

স্ত্রী। পরীক্ষক ছিলেন কাহারা?

স্বামী। সবই ইংরেজ!

স্ত্রী। তবেত বড় আশ্চর্য্য! স্বজাতির উপরে, পরাজিত প্রজাকে উচ্চস্থান দিতে ইংরেজেরা কোন প্রাণে সমর্থ হইলেন? তাঁহাদের সংকোচ বোধ হইল না? তাঁহাদের খুব ত বুকের পাটা!

স্বামী। ইংরেজের ত ঐটীই প্রধান গুণ! উঁহারা আত্মগরিমার উদ্দেশ্যে সত্যের অপলাপ করেন না।

আনন্দের বিষয়—পূর্ব্বকালে কালিদাস বলিয়াছিলেন "কবিতা যদাস্তি রাজ্যেন কিং?" অর্থাৎ যদি যথার্থ কবিতাশক্তি থাকে, তবে রাজা হইয়া আবশ্যক কি? কেননা, রাজা প্রজাসম্বন্ধীয় নানা বিবাদ-বিপ্লব সহ্য করিয়া তবে রাজত্বের সুখ অনুভব করেন, কিন্তু কবি রাজাকে দুটী মিষ্ট কথার কুহকে নিমগ্ন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই রাজত্বের অংশ ভোগ করিয়া থাকেন। পশ্চিম প্রদেশে মাড়বার-ভূমিতে মুরারি দান নামক মহাকবি যোধপুরাধিপতি সর্দ্দার সিংহের নিকটে এইরূপ সম্মান সূচক এক লক্ষ টাকা, ১২৫ খানি গ্রাম ও মণি কাঞ্চনাদি পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই পোড়া-বঙ্গ দেশে এরূপ প্রবৃত্তি লোকের পূর্ব্বে ছিল না। তাই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন অন্তিমে মহা-অভাবে মহাকষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয়, ঈদৃশ সৎকার্য্যের দিকে সকলেরই এক্ষণে মনের টান্ দেখা যাইতেছে। তাই ত্রিপুরাধিপতি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাবু গগনেন্দ্র ঠাকুর, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মগণ অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অন্য কবিদেরও বুকে ভরসা জন্মে।

মহারাণীর মহাগুণ—মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক্ষণে বয়োজীর্ণা ও দৃষ্টিশক্তি-হীনা, তথাপি যৌবনের ন্যায় তেজস্বিনী আছেন। তিনি এখনও পারিবারিক সমস্ত খুঁটীনাটি ও রাজকার্য্যের সকল আবশ্যক বিষয় নিজে না দেখিলে তৃপ্ত হন্‌না।

নূতন আবিষ্কার—(১) একস্‌রেজ্ নামক একটী রাসায়নিক যন্ত্রে মানুষের অস্থি-মাংসময় আবরণ কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া যায়, এবং তদ্বারা ভিতরকার নাড়ীভুঁড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। (২) যে কোনও গান, বক্তৃতা বা কথা চিরকালের-তরে বাক্সের মধ্যে ভরিয়া রাখা যায়। যতদিন পরে যখন ইচ্ছা তখনই ঐ বাক্স খুলিয়া ঐ গান প্রভৃতি শুনিতে পাইবেন। (৩) সাধারণ ফটোগ্রাফে ছবি ত নড়ে চড়েনা, কিন্তু এক রকম নূতন ফটোগ্রাফ হইয়াছে তাহাদ্বারা মানুষের দৌড়াদৌড়ী, হাত পা নাড়া প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ ভঙ্গিই চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায়। (৪) একরূপ যন্ত্র সৃষ্ট হইতেছে তদ্দ্বারা বিনাতারে সুদূর বাসী বন্ধুগণ পরস্পর কথা কহিবেন। (৫) আর এক রকম কল উড্ডা-

বিত হইতেছে তাহাদ্বারা মানুষের মুখ দেখিয়া মনের চিন্তা বুঝিতে পারা যাইবে। এসকল ভাবিলে আবিষ্কারক পাশ্চাত্য জাতিকে দেবতা বলিয়া মনে হয়।

চাসে ম্যালেরিয়া নাশ।—লাঙ্গল চষিয়া ম্যালেরিয়া দূর করিতে পারা যায়, তাহা বোধ করি আমাদের অনেক পাঠকেই বিদিত আছেন। বিলাতের একজন ডাক্তার ইতিমধ্যে যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে কৃষিকার্য্যের জন্য মাটীতে যে গো মনুষ্যাদির মলমূত্র মিশাইতে হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যহানির কোন সম্ভাবনা নাই। আপাততঃ উহা হানিজনক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল মলমূত্র যতক্ষণ মাটীতে থাকে ততক্ষণ একটু দোষজনক হয় বটে, কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গপোষণে প্রযুক্ত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। পল্লীগ্রামের মলমূত্র জমির সাররূপে পরিণত হয় বলিয়া তথায় কতকগুলি রোগ দৃষ্ট হয় না।

যথার্থ নিরামিষাশী—দুগ্ধ অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া নিরামিষভোজী বলিয়া শ্লাঘা করা যায় না, প্রকৃত নিরামিষ-ভোজী হইতে হইলে, দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা মাখন প্রভৃতি সকলকেই ত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু যে জন্তুর দুগ্ধ, তাহাতে সেই জন্তুর মাংসরস আছে।

কলিকাতার প্লেগ—কলিকাতায় যাহাতে প্লেগ প্রবিষ্ট না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভগবৎকৃপায় এ চেষ্টা অদ্যাপি নিরর্থক হয় নাই। বর্ত্তমান আগষ্ট মাসে বিলাত হইতে প্লেগ কমিশনের রিপোর্ট ভারতে আসিয়া পহুঁছিবে। উহা দেখিবার জন্য অনে-কেরই কৌতূহল আছে।

রেভিনিউ ও পবলিক্ ওয়ার্কস্—ডিপার্টমেণ্ট ২৮শে অক্টোবর হোম্ডিপার্টমেণ্ট ৩১শে অক্টোবর, ফাইনেন্‌স ৪ঠা নবেম্বর, মিলিটারী ১০ই নবেম্বর। উপরোক্ত তারিখে সিম্‌লা-শৈলের আফিস্ সকল বন্ধ হইবে। কেবল লেজিস্ লেটিভ ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে এখনও তারিখ স্থির হয় নাই।

লোক গণনা—আগামী ১৯০১ সালে এবার যে লোক গণনা হইবে, তাহার কমিশনার পদে, মিঃ এইচ্ এইচ্ রীজলি সাহেব নিযুক্ত হইবেন। তিনি অক্টোবর মাসে স্বদেশ হইতে প্রত্যাগত হইবেন।

দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত—দাক্ষিণাত্য এবং পাঞ্জাব প্রদেশে শস্যের অবস্থা ভাল নহে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছে, গবাদির ভক্ষ্য তৃণ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে দুস্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এখন খুব বৃষ্টির আবশ্যকতা। আগরা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, রায় বেরিলী প্রভৃতি স্থানে শস্যের মূল্য বাড়িতেছে। জুনগড় রাজ্যে ও গুজরাটে বিলক্ষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। জুনগড় দরবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের পোষণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, বোম্বাই প্রদেশস্থ আনন্দ নগর প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই অল্প অধিক বৃষ্টি হইলেও শস্যের মূল্য বাড়িতেছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ইহাই চির বিশ্বাস "জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।"

নিতান্ত দুঃখের সহিত আমরা প্রকাশ করিতেছি, বিডনষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর সি, আই, ই, মঙ্গলবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও আয়ুর্ব্বেদে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তিনি পাশ্চাত্যাঞ্চলে এদেশীয় গাছ গাছড়ার অদ্ভুত গুণ ও উপকারিতা প্রচারার্থ যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবাসী মাত্রই তাঁহার নিকট ঋণী।

রেঙ্গুনের মহাজনেরা এখন হইতে টাকা কড়ি ধার দেওয়া বন্ধ করিতেছে, প্রাপ্য টাকা কেবল আদায় করিতেছে, তাহারা কোথায় যেন শুনিয়াছে যে আগামী ডিসেম্বর মাসের কোনও একদিন পৃথিবীর ধ্বংস হইবে। ইহাতে নিম্ন শ্রেণীর ত কথাই নাই, মধ্যবিত্ত লোকেরও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

নরওয়ে প্রদেশে ইতিমধ্যে নাকি এক আইন পাশ হইয়াছে। যে বালিকা শিল্পকার্য্য, সূতা প্রস্তুত ও রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা না দেখাইবেন তাঁহার বিবাহ হইবে না, এ আইন মন্দ নয়; বিলাসিতা নিবারণের সুন্দর উপায়! এই দরিদ্র বঙ্গদেশে কুড়িটাকা বেতনের গরীব গৃহস্থেরও পাচক ব্রাহ্মণ না হইলে চলে না। এদেশেও ঐ আইনটীর প্রচলন হইলে ভাল হয় না কি?

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যসমূহ এইবার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচার প্রাপ্ত

হইতে চলিল। কলিকাতায় একটী সমিতি হইয়াছে। তাহার সভ্যেরা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষান্তে ভাল ভাল ভেষজগুলি ইংরেজদের ভৈষজ্যাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইবে। এই কমিটীর অন্যতম সদস্য হুপার সাহেব সংপ্রতি বিলাতে আছেন। সারবস্তু পাইলে, ইংরেজ যেখান সেখান হইতেই লইতে পারেন, তাহাতে অভিমান নাই।

ভাষানুবাদ।

সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদ দ্বারা সাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাষানুবাদ দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, ভাষানুবাদ দ্বারা আপাততঃ উপকার প্রতীয়মান হইলেও ভিতরে ভিতরে অবনতির পথই পরিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং ইহা উপকার নহে উপকারাভাস মাত্র। কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিষ্কাশনে প্রয়াসী হইলে প্রথমতঃ উভয়পক্ষে কথার তারতম্য বিবেচনা করাকর্ত্তব্য। অতএব দেখা যাউক ভাষানুবাদপ্রিয়গণ ভাষানুবাদের আধিক্য প্রদর্শনার্থ কীদৃশ যুক্তিনিবহের অবতারণা করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষগণ তৎপ্রতিকূলেই বা কি বলিয়া স্বমতসংস্থাপন করেন। যাঁহারা ভাষানুবাদের প্রশংসা করেন তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুকুলক্লিষ্ট হইয়া এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও জন সাধারণ যে যে গ্রন্থ সমূহের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন না, ভাষানুবাদের সাহায্যে আজ তাহা হস্তামলকের ন্যায় সম্মুখে অবভাসমান হইতেছে। পুরাণাদির আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ঋষিগণ অনাহারে অনিদ্রায় অনন্তচিন্তায় অতি দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেন বটে, অবশেষে স্বীয় ভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে কষ্ট দেওয়াই শেষ ফল দাঁড়াইত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই মীমাংসা হইত না। আজকালও হইতেছিল না। ভাষানুবাদরূপ নব বিভাকর যে দিন হইতে বিজ্ঞানরূপ ময়ূখমালায় আমাদের হৃদয়

জন্মান্তরীণ আন্তরিক গাঢ় অন্ধকারকে দুরাপসৃত করিয়াছে, সেই দিন হইতে জগৎ যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা কে না বলিবে? আরও পূর্ব্বে যিনি কোন এক গ্রন্থের কোন একটী তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তিনি তাহা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া এবং ধনাপেক্ষা নিভৃত স্থানে রাখিয়া, জন সাধারণের নিকট যাহা একটা মিথ্যা আড়ম্বর দেখাইতেন বা জন সাধারণকে তজ্জন্য যাহা দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিতেন, ভাষানুবাদের সাহায্যে সেই স্বার্থপর আত্মম্ভরি ব্যক্তি নিচয়ের সেই বৃথা গর্ব্ব ও মিথ্যা আড়ম্বর একেবারেই চূর্ণ হইয়াছে। এবং তত্ত্ব পিপাসু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকেও অনর্থক উৎকণ্ঠার অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে না। আরও সুবিধা দেখুন ইতঃপূর্ব্বে যদিও কেহ কেহ কথঞ্চিৎ কিছু কিছু শাস্ত্রমর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কালক্রমে একবার যদি তাহা বিস্মৃতি রূপ গভীর গুহায় বিসর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে, তাহা আর প্রায়ই মিলিত না। যদিও কথঞ্চিৎ কিছু উদ্ধৃত হইত, তাহা আবার সন্দেহ পাংশু বিজড়িত হইয়া বিভিন্নাকারে পরিণত হইত। ভাষানুবাদ, আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব গুলিকে বিস্মৃতি পিশাচীর করাল কবল হইতে চির রক্ষা করিতেছে। যখন যে বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে, তখন তত্তৎ বিষয় স্মৃতি পথে উদিত না হইলেও লবমাত্র কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভাষানুবাদ-পূত শাস্ত্র গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে, অনায়াসে তত্তৎস্থল অবভাসিত হইতেছে, ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইতেছে। তজ্জন্য লবমাত্র মানসিক পরিশ্রম বা ইতরের তোষামোদের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাষানুবাদের হিতকর আবির্ভাবে শাস্ত্রীয় সার নিচয় তাম্র ফলক খোদিত বর্ণাবলীর ন্যায়, অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিগৃহে সংরক্ষিত হইল। আরও ভাবিয়া দেখুন ভাষানুবাদ হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থের নামই অবিদিত ছিল। যদিও স্থানে স্থানে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত, তাহা সার্ব্বভৌম বা সার্ব্বজনীন নহে। ভাষানুবাদ আমাদের সে শোচনীয় অভাব আজ দূর করিয়াছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটী কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অল্পাধিক ভাবে আলোচনা করিতে উৎসাহিত হইতেছেন। এবং সংস্কৃত গ্রন্থ যে

কি জিনিষ ও পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণের যে কীদৃশী প্রতিভা, ভাষানুবাদই তাহা জগৎকে জানাইয়া দিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে এই ভারত-ছিল এবং এই ভগবদ্গীতাও ছিল, কিন্তু উপস্থিত সময়ের ন্যায় শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতার ঈদৃশ সমধিক সমাদর দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি? আজ ভাষানুবাদের প্রসাদেই আমাদের অমূল্য রত্ন আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনন্তসার সেই "গীতা" প্রতিগৃহে বিরাজিত। পূর্ব্বে সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিলেই মনে যেন কি একটা ভয় আসিয়া অন্তঃকরণকে পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিত। ভাষানু-বাদরূপ পরিষ্কৃত পথের পথিক হইতে পারিয়া অন্তঃকরণ আজ সে ভয়ে ভীত নহে। ভাষানুবাদকে সহচর করিয়া শাস্ত্র বারিধির গভীরতম প্রদেশ হইতেও সার রত্ন সংগ্রহে সাহসী হইয়াছে। ভাষানুবাদরূপ রজঃ সংঘর্ষণে চিত্ত দর্পণের অজ্ঞান কালিমা আর নাই। এই রূপে ভাষানুবাদের কয়টী প্রশং-সার কথা বলিব? জোর করিয়া বলিতে পারি, জগৎ যদি তত্ত্ব পিপাসু হইয়া থাকে তবে এই ভাবানুবাদেই। জগৎ যদি উন্নত হইয়া থাকে তাহা ভাষানু-বাদের অনন্তপরিণাম মাত্র। কি কায়িক কি বাচিক কি মানসিক সমস্ত উন্নতির ভাষানুবাদই অঙ্কুর।

পাঠক! ভাষানুবাদ-প্রিয়গণের ভাষানুবাদ-প্রশস্তি ত শুনিলেন, প্রতিকূল বাদিগণ কি বলেন শুনুন। ভাষানুবাদ দ্বেষিগণ বলেন—ভাষানুবাদ সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রশংসার কথা বলা হইয়াছে সব কয়টীই ভ্রান্তের প্রলাপ বা অপ-রিণাম দর্শিতার অনন্ত ফল। আর্য্যগণের মতে তাহাই অনিন্দিত ও আশ্রয়-ণীয় যাহা বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী হইয়া ইষ্টফল প্রদানকরে। অর্থাৎ যাহার আপাত মধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইলে পরিণামে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের আশঙ্কা অনিবার্য্য তাদৃশকার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। যেমন শ্যেন যাগ আপাততঃ শত্রুমারণরূপ ইষ্টফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে প্রাণিহিংসারূপ অনিষ্টের অনুবন্ধী বলিয়া, তাহা প্রশস্ত বা শিষ্টগণের আচরণীয় নহে। সহজ কথায় পাণ্ডুরোগী তাৎকালিক সুখপ্রদ অম্লরস সেবন করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তাহার প্রতি তিন্তিড়্যাদি ব্যবস্থা কি বিধেয়? কখনই নহে। তদ্রূপ ভাষানুবাদ আপাততঃ উপকারের আভাস মাত্র দর্শাইয়া উন্নতি মার্গকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে ও ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে বলিয়া

একান্ত পরিত্যজ্য। পূর্ব্বে প্রথা ছিল উপনয়নান্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ যাবৎ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং গুরুর নির্দেশে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দারগ্রহণ করতঃ গৃহস্থ হইবে। যাঁহারা ভাষানুবাদের দ্বারা কৃতার্থন্মন্ত হইয়াছেন; বেদাজ্ঞা প্রতিপালন করাত দূরের কথা তাঁহারা ঈদৃশ নির্দেশ নিচয়ে অশ্রদ্ধা করিতে দোষ দেখাইতে অসভ্যতা প্রতিপাদন করিতে খুবই উৎসাহিত হন। একে ত বেদাজ্ঞার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই মহাপাপ। অধিকন্তু যথেচ্ছাচারী হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতে অনুমাত্র ভীত নহেন; যেহেতু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন।

"যো শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

মহানুভব ঋষিগণ কর্ত্তৃক যাহা পূর্ব্বে মীমাংসিত হয় নাই, আজ শত সহস্র যত্নেও যে তাহার অণুমাত্র মীমাংসার পথে আরূঢ় হইবে, ইহা ভাবাই ভ্রান্তি। তবে যাহা কিছু সম্প্রতি পরিষ্কৃত বা নূতন বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়, তাহা আর্য্য শাস্ত্রের আমূল আলোচনার অভাব মাত্র। এখনও আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, যে সমস্ত সার নিচয় দৃষ্টিপথে আইসে, তাহার শতাংশের একাংশ ও আধুনিক কেহই আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই বা পারিবেন না। ইহা একান্ত সত্য যে, যাহা ছিলনা তাহা আজও নাই; যাহা নাই ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। স্বয়ং ভগবানই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

"না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"।

(ক্রমশঃ)

প্রহরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা মহাপাত্র।
গোপীবল্লভপুর—মেদিনীপুর।

দ্রব্যগুণ বিচার।

("এলা"র শেষাংশ।)

প্রয়োগ—ছোট এলাচ ও বড় এলাচ উভয়ই লোকে প্রধানতঃ পানের মস্‌লা স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে পানের উপকারিতা বর্দ্ধিত হয়। ছোট এলাচ তরকারী ব্যঞ্জন ও মাংসাদি পাককালে সৌরভের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কবিরাজীতে শুধু ছোট এলাচ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু শুধু বড় এলাচ সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বড় এলাচের গুঁড়া কবিরাজেরা শ্বাসরোগের ও বায়ু রোগের ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ছোট এলাচ অজীর্ণ ও উদরাধ্মান নাশক ঔষধ সমূহের মধ্যে উপকরণ স্বরূপ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। উভয় এলাচই একত্রে কবিরাজী পাকতৈলে গন্ধপাকে প্রযুক্ত হয়।

বড় এলাচ, কর্পূর ও মিশ্রী শূলের ব্যথাকালে মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে চুষিলে অনেকটা শান্তি হয়। বড় এলাচ, বচ, যষ্টিমধু ও মিশ্রী একত্র সিদ্ধ করিয়া গরম গরম ক্বাথ পান করিলে শুষ্ক কাসের বেগ নিবারিত হয়। উদরের বায়ুনাশের পক্ষে ছোট এলাচ বড় উপকারী, ইহার সহিত লবঙ্গ, মউরি, হিং প্রভৃতি যোগ করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পেট ফাঁপা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়। সোণামুখী প্রভৃতি রেচক দ্রব্য সেবনে পেট কামড়ানি উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ের সহিত ছোট এলাচ সংযুক্ত হইলে ঐ উপদ্রব আর থাকে না। ছোট এলাচ হইতে এক অতি উৎকৃষ্ট পাতলা তৈল বাহির করা হয়, তাহাকে "ক্যাজিপুটী অএল্" বলে। ইহা অতীব তীব্র সুগন্ধি, ১০।১৫ ফোঁটা জলের সহিত খাইলে পেট খোঁচানি, পেট ফাঁপা সারে এবং বাহিরে ব্যথা স্থানে মালিশ করিলে উহা সদ্য নিবারিত হয়। ক্যাজিপুটী অয়েল, তার্পিন তৈলে ও কেরোসিন তৈলে একত্র মিশাইলে অতি উত্তম বাতব্যথা-নাশক মালিশের তৈল প্রস্তুত হয়। ক্যাজিপুটী অয়েল সস্তা জিনিস্, বড় বনিকের দোকানে বা ডাক্তার খানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার এক খড়িকা প্রমাণ পানে দিলে উহাতে কতক গুলি এলাচের দানার অপেক্ষাও অধিক সৌগন্ধ হয়।

ওল।

বাঙ্গালা নাম—উপরি-উক্ত, হিন্দী—জমিন্ কন্দ বা ওল, ইংরাজী—Amorphophallus paniculatis. সংস্কৃতপর্য্যায়ঃ—শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শঘ্ন ইত্যপি। সংস্কৃত নাম—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল এবং অর্শোঘ্ন। আরো এই কয়টী নাম আছে—কণ্ডূল, সুকন্দী, স্থলকন্দক, দুর্নামারি, সুবৃত্ত, বাতারি, তীব্রকণ্ঠ, রুচ্যকন্দ।

ইহা একপ্রকার এক গুস্ত-যুক্ত ছত্রাকার গুল্মের গোলাকার কন্দ বা মূল, ওজনে এক পোয়া হইতে ২।৩ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ওল মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে একটী ভাল জিনিস। গৃহ-জাত ও বন্য এই দুই প্রকারের আছে, বন্যগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার ও অধিক তীক্ষ্ণ। খাদ্যরূপে ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য গৃহজাতই ভাল, বন্যগুলির রস কতিপয় কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওল সমুদায়ের বর্ণের তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন গুলি অধিক লাল, কোনগুলি অপেক্ষাকৃত শাদা, কিন্তু ইহাদের জাতিগত বড় কিছু ভেদ নাই। "মান্দ্রাজী ওল" নামে এক প্রকার ভিন্নজাতি ওল কলিকাতায় মিউনিসিপাল বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে, ত সুন্দর তরকারী, কাঁচা চিবাইলেও গলা চুলকায়না।

> শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডূকৃৎ কটুঃ।
> বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ॥
> বিশেষা দর্শসে পথ্যঃ প্লীহ গুল্ম বিনাশনঃ।
> সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
> দদ্রুণাং রক্তপিত্তাণাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
> সন্ধানযোগ সম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ॥

রস—কটু ও ঈষৎ কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ, গুণ—দীপন, রুক্ষ, কণ্ডূজনক, বিষ্টম্ভী (অধিক খাইলে পেট ভার রাখে) বিশদ (ক্লেদহীন এবং মুখের ক্লিন্নভাব দূরীভূত করে) রুচিজনক, কফ ও অর্শোঘ্ন, লঘু, বিশেষতঃ অর্শোরোগীর সুপথ্য। সমস্ত কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইহা উৎকট দদ্রুরোগী, কুষ্ঠরোগী ও রক্তপিত্তাক্রান্ত

ব্যক্তির পক্ষে উপকারী নহে। সন্ধান যোগে অর্থাৎ ঘোল যমানী প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিলে, ইহা আরো অধিক গুণকর হয়।

প্রভাব—অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্মনাশক। ঔষধের উপকরণার্থে বন্য ওলই প্রশস্ত। শাস্ত্রে যদিও ঔষধের উপকরণ বিবৃতি কালে শুধু "শূরণ" শব্দ লিখিত আছে এবং তৎপূর্ব্বে "বন্য" এই বিশেষণ সংযুক্ত হয় নাই, তথাপি তৎ স্থানে বন্য ওলই বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয় তাঁহার অনুবাদ পুস্তক সমূহে সর্ব্বত্রই শূরণ শব্দের অর্থ বন্য ওল করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা আমাদের মতে তিনি বিশেষ বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয়ই দিয়াছেন। বন্য ওলে এই ঔষধীয় শক্তি আসিল কোথা হইতে? ইহা যে অর্শঃ গুল্ম প্রভৃতি রোগের প্রতীকারক, তাহার মূলীভূত কারণ কি? কারণ কেবল ইহার অধিকতর তীক্ষ্ণত্ব ও কটুত্ব। এই গুণেই ইহা আগ্নেয়। আগ্নেয় বস্তু ছাড়া অর্শঃ প্লীহাদির প্রশান্তি কে করিতে পারে? বন্য ওল চিতামূলের * প্রায় সম গুণ। একটুখানি মুখে বা অন্য কোমলস্থানে লাগাইলেই যে ইহারা জ্বালা উৎপন্ন করে, এই শক্তি দ্বারাই উহারা অগ্নি কারক ও ক্ষুধাজনক। আদা প্রভৃতি ঝাঁজাল জিনিস্ চিবাইলে মুখ মধ্য হইতে যেরূপ লালাস্রাব হইতে থাকে, উদর-গহ্বরে বন্য ওল প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়াও সেইরূপ পাচক পিত্তকে সমধিক মাত্রায় নিঃসারিত করায়। সুস্বাদু সুখসেব্য ওলে এ গুণটী বড় বেশী নাই; কিন্তু উহাতে অন্যান্য গুণ অবশ্য বর্ত্তমান,—ইহা পুষ্টিকারক ও সারক কিন্তু ঈষৎ আগ্নেয়।

ঈদৃশ বিচার শুনিয়া বোধ হয় পাঠকের পক্ষে উভয় সঙ্কট বোধ হইতেছে—যেটী অধিক গুণকর তাহা অখাদ্য; আর যেটী সুখসেব্য, তাহাই অল্প গুণদায়ক। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য, যাঁহারা ওল-প্রিয় তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া শুধু ভাল ওল খাইবেন না এবং বন্য ওলকে আর অত ঘৃণা করিবেন না। উহাকেও মধ্যে মধ্যে ভাতে সিদ্ধ করিয়া ভাতের গ্রাসে লুকাইয়া কোনরূপে গলাধঃ করিবেন। কিন্তু অল্প চাউলে যেন অধিক ওল সিদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে সমস্ত ভাত কটুরসান্বিত হইতে পারে।

---

* চিতামূল একটী আগ্নেয় বস্তু, শাস্ত্রে ইহার একটী নাম 'বহ্নি'।

লোকে ওলের ডাল্না, বড়া-ভাজা, অম্বল, আচার ও চাট্নী করিয়া খাইয়া থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ ইহা ভাতে দিয়াই অধিক লোকে আহার করে।

ওলের চাটনী—শ্বাস, অম্লপিত্ত ও অর্শোরোগীর উপকারী; ইহার প্রস্তুত করণ প্রণালী এই—প্রথমে এই উপকরণ গুলি যোগাড় করিবে যথা,—ওল এক পোয়া, পুরাতন তেঁতুল শাঁস দেড় পোয়া, ইক্ষু গুড় বা পরিষ্কার চিনি এক পোয়া, খাঁটী সরিষার তৈল এক পোয়া, সৈন্ধব লবণ চারি আনা, হরিদ্রা বাটা দেড় তোলা, রাইসরিষা বাটা দুই তোলা, ভাজা সরিষার গুঁড়া আধতোলা, ভাজা মেথির গুঁড়া আধতোলা, ভাজা পাঁচ ফোড়নের গুঁড়া এক সিকি।

প্রথমে ওলের খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ২।৩ ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন জলে দুতিন বার ধুইয়া ফেলিবে। ২ সের জলে ঐ ওল সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল জলে ধুইবে ও কাপড়ে টাঙ্গাইয়া জল ঝরাইবে। একটা মুখ-চওড়া হাঁড়িতে বা কড়াতে তিন ছটাক তৈল চড়াইয়া দিয়া তাহাতে ওল গুলি দিয়া খুন্তী চালনা দ্বারা গুলিয়া দিবে ।যখন ওল একটু বাদামী রং হইবে তখন তাহাতে হরিদ্রা বাটা, সরিষা বাটা, ও লবণ দিয়া নাড়িবে ও ১ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া উহাতে ঢালিবে, একটু টানিয়া আসিলে অবশিষ্ট ৵৹ ছটাক তৈল দিবে, ফুটিয়া উঠিলে অবশিষ্ট গুঁড়া মস্লাগুলি ফেলিয়া অল্পক্ষণ নাড়া চাড়া করিয়া নামাইয়া কাচ, প্রস্তর বা মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহা পনর ষোল দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

তাম্র ভস্ম করিয়া, পরে ওলের মধ্যে পুরিয়া পুনরায় পোড়াইলে ঐ ভস্ম নির্দ্দোষ হয়, এই প্রথাকে তাম্রের অমৃতীকরণ বলে।

ডাঃ থরটন বলেন কীটাদি দংশন করিলে, দষ্টস্থানে বন্য ওলের পুলটীস্ লাগাইলে উপশম হয়। বোম্বাই সহরে চাকা-চাকা-কাটা শুষ্ক ওল বণিকের দোকানে বিক্রয় হয়। উহা জলে সিদ্ধ করিয়া বারমাসই খাওয়া যায়। লাল অপেক্ষা শাদা ওল গুলি কম কুট্ কুটে। বুনো ওলও শিথিল জমিতে চাস করিলে ক্রমে উহা সুখাদ্য হয়। ওল দশ পনর সের পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে।

শূলের সামুদ্রাদ্য চূর্ণ, অম্লপিত্তের বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা, বিশেষতঃ অর্শের স্বল্প ও বৃহৎ শূরণ মোদকে ওল আবশ্যক হয়।

কইমাছ।

বাঙ্গালা নাম—ঐ, হিন্দী—কবই, সংস্কৃত—কবিকা, এ মৎস্য অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, কলিকাতা-অঞ্চলে "যশুরে কই" বড় প্রসিদ্ধ। ইহার মাথা মোটা, শরীর কৃশ, দেখিতে অধিক বড় নয়, যশোহর জেলায় অনেক পুকুর খানা ডোবা আছে, তাহাতে কইমাছ যথেষ্ট, উহা কলিকাতায় আনীত ও বিক্রীত হয়,—রাস্তায় আসিতে আসিতে মৃতপ্রায় ও শুষ্ককায় হইয়া যায় বলিয়াই ঐরূপ দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় নূতন বাজারে সময়ে সময়ে খুব বড় বড় কই বিক্রয় হয়, ওজনে একপোয়া দেড়পোয়া। স্রোতের জলে কই থাকে না, প্রায়শঃ স্রোতোহীন জলাশয়ে থাকে, ময়লা জলে অধিক উৎপন্ন হয়। এই মৎস্যের জীবন শীঘ্র বাহির হইতে চাহেনা, খণ্ড খণ্ড হইয়া তৈলোপরি নিক্ষিপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত নড়িতে থাকে ও হৃদয়বান্ দর্শকের মর্ম্ম স্পর্শ করে।

> কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
> কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—স্নিগ্ধ (শীতল ও চর্ব্বীযুক্ত) কফঘ্ন, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক। "কফঘ্না'' এই পাঠস্থানে "নাতিকফকৃৎ" এই মর্ম্মযুক্ত পাঠ হওয়া উচিত। উক্ত পাঠ বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে হইয়া থাকিবে। যেহেতু বাস্তব পক্ষে কইমাছ (এমন কি, প্রায় কোনও মাছই) কফঘ্ন নহে, বরং কফজনক, তবে কই মৎস্য ততটা কফজনক নহে। প্রথম পংক্তিটী এইরূপ হইলে ভাল হইত যথা—কবিকা নাতিকফকৃৎ স্বাদুঃ স্নিগ্ধা রুচিপ্রদা। অথবা সোজাসুজি "কফঘ্না" স্থানে "কফদা" করিলে আর গোল থাকেনা।

প্রয়োগ—এই মাছ সুমিষ্ট, সুখাদ্য, সুতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে তরকারীর সহিত মিলিত হইয়া পাক-নিষ্পন্ন হয় তাহাকেই সুমধুর করে; শুধু মাধুর্য্য গুণে প্রসিদ্ধ নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। এই মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্র ততুলনায় ইহাতে সমধিক পরিমাণে তৈলাংশ আছে। এই তৈলাংশ দেহের

পুষ্টিসাধক, ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্দ্ধক। "ফস্ ফরস্" নামক ওজস্কর পদার্থ ইহাতে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, তজ্জন্ম ইহা ক্ষীণমস্তিষ্ক ও ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির পক্ষেও উপকারী। রোগীর পথ্য বলিয়া ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ; যে রোগ হইতেই মুক্তিলাভ হউক, চিকিৎসক কই (ও মাগুর) মৎস্যের ঝোল প্রথমে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তথাপি ইহার স্নিগ্ধত্ব গুণে অন্যান্য রোগ অপেক্ষা ইহা উদরাময়ের বা অন্য রৌক্ষ্যকারক রোগের পরেই অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। উদরাময় বা অজীর্ণরোগী ইহার সুস্বাদে প্রলোভিত হইয়া যেন অধিক খাইয়া না ফেলেন, কেননা আভ্যন্তরিক তৈলাংশ বশতঃ ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক। মৎস্য অপেক্ষা উক্ত মৎস্যের ঝোলই ঐরূপ রোগীর উপকারী। কৈমাছের ডিম্ব বড়ই সুকোমল ও সুখাদ্য! ইহা এই মৎস্য অপেক্ষাও লঘু-পাক, সুতরাং অজীর্ণরোগীও নির্ভয়ে খাইতে পারেন। দেখা যায়, যাঁহারা বলিষ্ঠ ও ভোজন বিলাসী তাঁহারা প্রায়শঃ এই মৎস্যকে রোগীর পথ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু বেশ্ পুষ্ট ও মাংসল মৎস্য পাওয়া গেলে ও নিপুণ পাচকের হাতে পড়িলে ইহা তাঁহাদের নিকটে নিশ্চয়ই আদরণীয় হয়।

জীবদবস্থায় ইহার কাঁটা হইতে যেমন সাবধান থাকা উচিত—(যেহেতু হাতে ফুটিলে তজ্জনিত ব্যথা বা ক্ষত শীঘ্র সারেনা) রন্ধন-প্রস্তুত অবস্থায় ও আহার কালে ইহার কাঁটা সম্বন্ধে স্মরণ রাখা উচিত, নতুবা ভোজন সময়ে অজ্ঞাতসারে ইহার ভীষণ কণ্টক গলমধ্যে বিদ্ধ হইয়া প্রাণিহিংসা-পাতকের কিয়দংশে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দেয়।

কচ্ছপ।

বাঙ্গালা নাম—কাছিম বা কাছুয়া; হিন্দী—কচ্ছুয়া; ইংরাজী Tortoise সংস্কৃত পর্য্যায়:—কচ্ছপো গূঢ়পাৎ কূর্ম্মঃ কমঠো দৃঢ় পৃষ্ঠকঃ। সংস্কৃত নাম—কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ, দৃঢ়পৃষ্ঠক।

কাছিম অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহারা উভচর ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভেদে নানাপ্রকারের আছে; অর্দ্ধখানা নারিকেলের মালার মত ছোট কাছিমগুলি প্রায়শঃ পুকুরেই দেখা যায়; বড় বড় গুলির আবাসস্থান নদ-নদী। সমুদ্রে

এত বৃহৎকায় কাছিম আছে যে তাহারা পৃষ্ঠাঘাতে সাধারণ নৌকাকে নড়াইয়া দেয়; কলিকাতার পশুপক্ষি প্রদর্শিনী গৃহে একটা বড় কাছিমের হাড় আছে তাহার মধ্যে দু-তিন জন মনুষ্য শয়ন করিতে পারে।

এক রকমের ছোট ছোট কাছিম আছে, তাহারা স্থলচর,—পাড়াগাঁয়ে বাঁশবাগানের পচা পাতার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, ইহাদের মাংস জলচরের অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু ও উষ্ণবীর্য্য। কচ্ছপ নিজের অস্থিময় আবরণের মধ্যে পা লুকাইয়া রাখে, তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম "গূঢ়পাৎ"। ইহারা ভয় পাইলেই পা ও মাথা ঐ ভাবে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে।

কচ্ছপেরা জলাশয়ের তটে উঠিয়া মাটী খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়াইয়া যায়, ঐ ডিম সময়ে ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া জলে প্রবেশ করে। ডিম গুলি শাদা, হাঁসের ডিমের অপেক্ষা একটু ছোট।

কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ।

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—বলকারক, বাতপিত্ত নাশক; প্রভাব—পুংস্ত্বকারক (রতিশক্তি বর্দ্ধক)।

প্রয়োগ—কাছিমের মাংস বঙ্গ ও বেহার অঞ্চলের কোন কোন স্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ইহার মাংস বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ইহার মাংস বেশ্ সুস্বাদু এবং শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া বায়ু ও পিত্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে বড় উপকারী। ক্ষীণশুক্র পুরুষত্বহীন ব্যক্তি- ইহার মাংস ভোজনে ফল পাইতে পারেন। কচ্ছপ মাংস বায়ুপ্রধান পক্ষাঘাত রোগীর উপকার করে।

কচ্ছপের মাংস পুরাতন ঘৃতে সৈন্ধব চূর্ণ সহকারে ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া কাপড়ের পুঁটলীর মধ্যে রাখিয়া গরম গরম সেক দিলে বাত ও পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শায়। বাত ব্যাধি দ্বারা মুখ বেঁকিয়া গেলে বিকৃত স্থানে ঐ স্বেদ দিতে হয়।

কাছিমের পৃষ্ঠের চামড়া দ্বারা পূর্ব্বে ঢাল আবৃত হইত, এক্ষণে বন্দুকের বহুল প্রচলন হওয়ায় উহার ব্যবহার কমিয়াছে। ঐ চামড়া দ্বারা এক প্রকার জুতাও পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত, তাহা অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ়, সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে উহা ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কচ্ছপের নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ উদর দেশের

শুভ্রবর্ণ কঠিন অস্থি চর্ম্মকারেরা অস্ত্র ধার দিবার জন্য ও তদুপরি পা রাখিয়া বাটালি দ্বারা জুতা প্রভৃতির চামড়া কাটিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

কঞ্চট।

বাঙ্গলানাম—কাঁচড়া বা কাঁচড়া দাম; হিন্দী—জল চোলাই; ইংরাজী—maranthas Trinifolius. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—পানীয়ং তণ্ডুলীয়ং যৎ তৎ কঞ্চট-মুদাহৃতম্। সংস্কৃত নাম—পানীয় তণ্ডুলীয়, অন্যনাম—মারিষ, জলজ।

ইহা একপ্রকার "পানা" জাতীয় জলজ গাছ। ময়লা পুকুরগুলিকে এত আচ্ছন্ন করিয়া থাকে যে, জল দেখা যায়না। ইহার পাতা প্রায় ১ ইঞ্চ চওড়া, ঈষৎ গোল ও পুরু; সাধারণ পানার যেমন পাতাই সর্ব্বস্ব, ডাঁটা বা কাণ্ড থাকেনা, ইহার তেমন নয়, ইহার গাছ জলের নীচে নীচে বিস্তৃত হইয়া যায়। পাতা চিবাইলে একটু আঠা বোধ হয়।

কঞ্চটং তিক্ত কষায়ং রক্তপিত্তানিলাপহং।

রস—তিক্তকষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—রক্ত-পিত্তহর ও বায়ু নাশক।

প্রয়োগ—কাঁচড়া পাতার রস উদরাময়ে উপকারী। জ্বালাযুক্ত মেহ ও শ্বেতপ্রদর রোগে বিশেষ ফল দর্শায়। কাঁচড়া অন্যান্য সম-গুণ উপকরণের সহিত যুক্ত হইলে সমধিক উপকারী হইয়া থাকে যথা—

কঞ্চট দাড়িম জম্বু শৃঙ্গাটক পত্র হ্রীবেরম্।
জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুতা, ও শুঠ ইহাদের কাথ বেগবতী গঙ্গাকেও রোধ করিতে পারে, অর্থাৎ অতীব দুর্দ্দম অতীসারের বেগও নিবারণ করে।

শাস্ত্রোক্ত "গ্রহণীকপাট" "জাতীফলাদ্যা বটী" ও গ্রহণ্যধিকারের "কঞ্চটা-বলেহ" প্রভৃতি ঔষধে কাঁচড়াপাতা আবশ্যক হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশ।

অগ্রহায়ণ শুক্লা চতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার। ইংরাজি ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮২ সাল।

দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে ৩।৪টী ব্রাহ্ম ভক্ত। পরমহংস দেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশি লোক সমাগম হয়। যে সকল ভক্ত একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম মাষ্টার, ও অন্যান্য ভক্তেরা পশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহারা ঘরের পশ্চিমদিকের দ্বার মধ্যদিয়া ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারাণ্ডা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান। তার পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিমগায়ে পুণ্যসলিলা কলুষ-হারিণী গঙ্গা যেন ঈশ্বরমন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে কাপড়। বিজয় শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান, তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ সেবনের সময় হইলে খাইবেন।

বিজয় এখনও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া উপদেশ দিতে হয়। আবার সমাজের সহিত নানাবিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন

স্বাধীনভাবে কথা বার্ত্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে—জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত গোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন; আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে নৃত্য করিতে করিতে পরিধান বস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন—কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল—শরীর মধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ কলিকাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি ভগবান রামকৃষ্ণের দেবদুর্ল্লভ হরিপ্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

একটি ছোকরা নাম বিষ্ণু, এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারই কথা হইতেছিল।

(সংস্কার ও শেষজন্ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ করেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আস্‌তো, স্কুলে পড়্‌তো, কিন্তু বল্‌তো সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল। সেখানে নির্জ্জনে মাঠে বনে পাহাড়ের কাছে সর্ব্বদা বসে ধ্যান কর্‌তো। বলেছিল যে কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কর্‌তো।

"বোধ হয় শেষজন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ করা ছিল। একটু বাকি ছিল, সেই টুকু বুঝি এবার হয়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। শুনিছি একজন শবসাধন কর্‌ছিল গভীর বনে; ভগবতীর আরাধনা কর্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা

দেখিতে লাগিল শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব ও অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ্ করতে না করতে মা সাক্ষাৎপর হলেন ও বল্লেন 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। সে ব্যক্তি মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে বল্লে মা! একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি। তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়েছি। যে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এত দিন ধরে, তোমার সাধন করছিল তাকে তোমার দয়া হইল না, আর আমি কিছু জানিনা শুনিনা, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন আমার উপর এত কৃপা হ'ল? ভগবতী হাসিতে হাসিতে বল্লেন, বাছা তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই। তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাঠ হয়েছিল, তাই তুমি আমার দর্শন পেলে। এখন কি বর লবে বল।

(মুক্ত পুরুষ ও শরীর ত্যাগ)

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা করেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ফিরে ফিরে সংসারে আস্তে হবে আর এই সংসার-যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে থাকে তাহলে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে তাকে আত্মহত্যা বলেনা। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয় তখন মাটীর ছাঁচ রাখ্লে, পরে আবার ভেঙ্গে ফেল্তেও পার।

লঙ্কা টাকার কথা।

(১)

জগত্যানন্দসম্পূর্ণে ভগবত্যা মহোৎসবে।
দুঃখং প্রাহ সুখং ভ্রাতঃ ক যামি কস্য মন্দিরম্॥

শরতে করেন যবে দুর্গা আগমন,
সমস্ত জগৎ হয় আনন্দে মগন।

সর্ব্বত্রই সুখ হেরি কহে দুঃখ তাই,
কহ ভাই সুখ! কোথা কার বাড়ী যাই!

(২)

একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নির্গুণাঃ।
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাঙ্কেম্বিব বিন্দবঃ॥

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয়,
গুণহীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয়।
একের অভাবে নাহি শোভে অন্য দশ,
একেরে রাখিলে আগে, তবে মিলে রস।
অসার "শূন্যের" দেখ, নাহি কিছু সার,
কিন্তু আগে এক পেলে দর কত তার!

(৩)

রে বৎস সৎসঙ্গ মবাপ্নুহি ত্বমসৎপ্রসঙ্গং ত্বরয়া বিহায়।
ধন্যোঽপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাৎ সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে॥

অসাধুর সহবাস ত্যজিয়া সত্বর
ওরে বৎস! সাধু-সঙ্গ কর নিরন্তর।
দুষ্ট-সঙ্গে থাকি সাধু নিন্দা লভে কালে,
সিন্দূরের বিন্দু যথা বিধবার ভালে।

(৪)

সমাপ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ যঃ কৃষ্ণে ভক্তিমিচ্ছতি।
সাগরে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥

সাংসারিক কার্য্য আগে করি সমাপন,
পিছে দিতে চায় লোক কৃষ্ণ-পদে মন!
সাগর-তরঙ্গ-মালা হলে অবসান,
বর্ব্বরের ইচ্ছা যথা করিবারে স্নান!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা।

জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ও পুরাতত্ত্ববিৎ ইতিপূর্ব্বে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমার মত সামান্য ব্যক্তির কিছু লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালীর এবং ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে দেশ হইতে জাতিভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; শ্রেষ্ঠবর্ণ ও নিকৃষ্টবর্ণে তারতম্য রাখিবার প্রয়োজন নাই, জাতিভেদ-প্রথা উঠিয়া না গেলে আমাদের মধ্যে কোন প্রকারে হৃদ্যতা জন্মিবে না, নানা শ্রেণীর মধ্যে একসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবনা, এই যে বিশ্বাস আমাদের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে, ইহা মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী দেশে প্রচলিত হইবার পুর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্রাদির মধ্যে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। এখনকার মত বিভিন্নজাতির মধ্যে পরস্পরে আহারাদি সব কাজই (সমাজে না হউক সংগোপনে) চলিত না। একত্র আহারের কথা দূরে থাকুক, একাসনে উপবেশন করা ও নিষিদ্ধ ছিল। কেবল বিবাহাদিতে নহে, বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদও ছিল। ব্রাহ্মণ যজন যাজন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, বৈদ্য চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, কায়স্থ মসীজীবী ছিলেন, সদ্গোপ, সূত্রধর, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি শূদ্রগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে রত ছিলেন এবং তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে ও সুখশান্তিতে জীবন কাটাইতেন। কিন্তু যেদিন হইতে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, যেদিন ইংরাজ বলিলেন, "সকলেই বিদ্যা-লাভ করিবার অধিকারী, বিদ্যার নিকট জাতিভেদ চলিবেনা, সেরূপ করা পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, সুবর্ণবণিক, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি সকলেই এক বিদ্যায় বিদ্বান হইবে, এক শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, একপ্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী হইবে, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বিদ্যা ও জ্ঞানের তারতম্য থাকিবে না।" সেইদিন হইতে সদ্গোপ দলে দলে লাঙ্গল ছাড়িয়া, তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণ বণিক অলঙ্কার নির্ম্মাণ পরিহার

করিয়া, কর্ম্মকার লৌহযন্ত্র ছাড়িয়া, প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিখিতে ধাবিত হইলেন। বিড়ম্বনার ইহাই চূড়ান্ত নহে! ব্রাহ্মণগণও যজন, যাজন ও অধ্যাপনায় আর উদরপূর্ণ হয় না বলিয়া ইংরাজ-প্রদর্শিত চাকুরীর প্রলোভনে পড়িয়া, সেই মহৎ, পবিত্র কার্য্য ছাড়িয়া ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন। সেইদিন জাতিভেদরূপ বিচিত্র, সুবিশাল, কত সহস্র বৎসরের পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল! যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন না, যে শূদ্র তফাতে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকট নিজ বক্তব্য নিবেদন করিত, আজ সেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র মোহময় সাম্য-নীতিতে বিভোর হইয়া একবেঞ্চে, পার্শ্বাপার্শি উপবেশন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন; এক গ্লাসে জলপান করিতে লাগিলেন। কি মোহময় অপরূপ দৃশ্য! 'এত কালের স্বতন্ত্রতা, মর্য্যাদাজ্ঞান, ভয়ভক্তি সমস্ত দূর করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রকে একই প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব, পরস্পরের সহানুভূতিতে পরস্পরের হৃদয় ভরিয়া দিব, জাতীয় অনৈক্য দূর করিয়া এক মহাজাতির সৃষ্টি করিব', এই মহাবাক্য চারিদিকে প্রচারিত হইল। 'আমাদের মধ্যে যে একতা নাই, জাতিভেদই তাহার মূল, যে জাতির একতা নাই, সে জাতির উন্নতি কখনই হইতে পারে না; অতএব আমাদের বৈষম্যের বীজ জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।' সেই মত কার্য্য চলিতে লাগিল। ইংরাজি শিখিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ে লোকের ঘৃণা জন্মিতে লাগিল; দেশীয় শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য লোপ পাইতে লাগিল। ইউরোপীয় শিল্প বাণিজ্যজাত দ্রব্যে দেশ ভরিয়া গেল। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে এখন যত অসদ্ভাব জন্মিয়াছে, কোন কালে এত অসদ্ভাব ছিল না। হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া না গিয়া ঈর্ষ্যায় ও হিংসায় পুড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এতটা অনৈক্য কল্পনাতীত ছিল। এক মহাজাতি বা একাকারের এই সুন্দর, সুমিষ্ট ফল ফলিয়াছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

চিকিৎসা-সংবাদ।

১। জন-সাধারণে বিশেষতঃ স্ত্রী সমাজে এরূপ সংস্কার আছে যে কবিরাজী পাকতৈল মস্তকে মাখিলে অকালে চুল পাকিয়া যায়; আমরা কিন্তু অদ্যাবধি এরূপ একটী ঘটনাও ঘটিতে দেখিনাই। যাহারা বায়ুরোগ গ্রস্ত, তাহারাই পাকতৈল মাখে, বায়ুর জন্যই চুল পাকিয়া যায়, রোগী বা রোগিণী মনে করেন, তৈলেই চুল পাকিল।

২। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ কোন বিধবা রমণীর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে জ্বর আসিত, তৎকালে তাঁহার গা বমি বমি করিত ও তলপেটে ব্যথা হইত। এইরূপ ৬।৭ দিন হইয়াছে এমন সময়ে আমি চিকিৎসার্থ আহূত হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে রোগিনীর অনেক দিন জ্বর হয় নাই, অম্লপিত্ত নাই, ঋতু-দোষও নাই। ইহাকে জ্বরের বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ, ব্যথার মহাশঙ্খ বটী এবং বমিভাবের জন্য এলাদি চূর্ণ দিলাম। (কবিরাজী চিকিৎসায় প্রধানতঃ এইরূপ বিধি—অর্থাৎ যে যে উপসর্গ তাহার সহিত মিলাইয়া এক একটী বড়ী দেওয়া) ৩।৪ দিনে এ রীতিতে কিছুই ফল হইল না। তখন ভাবিলাম একটী মাত্র এমন কোন্ সোজাসুজী জিনিস্ আছে যাহা দ্বারা উক্ত তিন উপদ্রবই যাইতে পারে। সে জিনিস্—তাম্রভস্ম। শুধু মধু সহ দিনে তিন বার করিয়া তাম্রভস্ম দিতে দিতে সমস্ত উপসর্গ ক্রমে দূর হইল! তাই বলি, ভগবানের কৃপা না হইলে সব সময়ে সব কথা মনে উঠে না।

৩। লোকে বলে কবিরাজী চিকিৎসায় বড় বিলম্ব হয়। কিন্তু বিলম্বের রোগ গুলিই যে কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে আসে তাহা সকলে ভাবেন না।

৪। এক ব্যক্তি প্রথমে নানা চিকিৎসকের কাছে, নানা রূপ ঔষধ খাইয়া কিছুতেই ফল না হওয়ায় সমস্ত ঔষধ ছাড়িয়া দিয়া স্নানাহারাদির যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ইহা দ্বারাই রোগ আরোগ্য হইল। আর এক ব্যক্তি কিছুদিন ঔষধ খাইয়া বিরাগভরে পূর্ব্বোক্ত রোগীর উপায় অনুসরণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ সংহার করিল।

৫। সুশ্রুতীয় অস্ত্রচিকিৎসা কবিরাজ দিগের মধ্য হইতে বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে উহার আংশিক আলোচনা দৃষ্ট হয়। বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর চিকিৎসক সম্প্রদায় সুশ্রুতমতে ক্ষতরোগের অতি

আশ্চর্য্য চিকিৎসা করেন। আমরা দেখিয়াছি ইঁহারা ইংরাজ সার্জ্জনের পরিত্যক্ত আশাহীন রোগীকেও আরোগ্য করিয়াছেন।

৬। আমাদের কোনও পরিচিত ব্যক্তি বাজারে নাপিতের দ্বারা দাড়ি কামাইয়া দুরারোগ্য চর্ম্মরোগে অনেক দিন ভুগিয়া ছিলেন। সোমরাজীতৈলে উহা ভাল হইয়াছিল।

গুণবত্তার প্রশংসা।

অনুসন্ধান—ইহা একখানি অতি পুরাতন ও উচ্চশ্রেণীর সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। নিরপেক্ষভাবে দুষ্টের নিন্দা ও শিষ্টের প্রশংসা, এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব সারতত্ত্বের উদ্‌ঘাটনই সংবাদ-পত্রের প্রধান ব্রত। এই মহাব্রতের সাধনায় অনুসন্ধান চিরনিযুক্ত। আজকাল গালাগালি হুজুক্ প্রভৃতি যে সকল কলঙ্কময় ব্যাপার সংবাদপত্রের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে, তাহার লেশমাত্রও এই পত্রিকার অঙ্গস্পর্শ করে নাই। এই কাগজখানি মাসিক পত্রিকার ন্যায় বাঁধান—অন্যান্য সাপ্তাহিকের ন্যায় পাঠান্তে ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়। ইহার ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর; এ হেন পত্রিকার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই প্রার্থনীয়।

অন্তঃপুর—বরাহনগর হইতে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা লিখিত, স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিচালিত মাসিকপত্র। ইহাতে জ্ঞানগর্ভ কথা অনেক থাকে। মূল্য ১৲

প্রবাসচিত্র—শ্রীযুক্ত জলধর সেনের মাধুর্য্যময়ী লেখনীর সুমধুর ফল। গ্রন্থকার প্রথমযৌবনে তাঁহার গুণময়ী অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রীর বিয়োগ-শোকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণের মায়া ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে ঘুরিয়াছিলেন—একে হিমালয়ের দৃশ্যাবলি অবর্ণ্য মনোরম, তাহাতে লেখক সুকবিও আবেগপূর্ণ-হৃদয়। সুতরাং পুস্তকখানি যে কি এক অপূর্ব্ব জিনিস্ হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। যাঁহারা হাওয়া খাইবার জন্য সুখে রেল-গাড়ী যোগে দেশান্তরে গিয়া সহর-সুলভ ইট কাঠ পাথর দেখিয়া বা ঊর্দ্ধ মাত্রায়, সায়ং-প্রাতর্ভ্রমণ কালে দুচারিটী গাছ পাথর দেখিয়াই কল্পনার জোরে কত কি লিখিয়া ফেলেন, তাঁহারা কখনই এরূপ জীবন্ত অপূর্ব্ব পুস্তক লিখিতে পারেন না। জলধর বাবু আজন্ম বিমল সাধুচরিত্র, সেই বিমলতার ছায়া পুস্তকের প্রতি-পত্রে প্রতিফলিত। মূল্য ১৲ মাত্র। শ্রীগুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

REG: No. C, 87

২য় বর্ষ, ৪র্থ, ৫ম সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক সডাক ১২।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর। ১৩০৬, আশ্বিন, কার্ত্তিক।

ঋষি

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—বিবিধ সংবাদ, আগমনী, নিদ্রা ও চরকোক্তি, আশা বৈতরণী নদী, বিনোদিনীর কটাক্ষ, জাতিভেদ সম্বন্ধে দু' চারিটী কথা, দ্রব্যগুণ বিচার, ভারানুবাদ, সুজন-প্রশংসা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রকৃতির শিক্ষা।

উৎকৃষ্ট ভাবময়ী পদ্য-পুস্তিকা। ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন। পড়িলে ভাবুকের মন প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখিয়া উন্মত্ত হয় ও ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া, ভগবানের দিকে স্রোতোরূপে বহিয়া যায়। মূল্য ।০ আনা। মফস্বলবাসী ।১০ আনা ডাঃ ষ্ট্যাম্প কবিরাজ মহাশয়ের ২০২ নং কর্ণওয়ালিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্ত আমরা দায়ী নহি। আকার (অনূ্যন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটির উল্লেখ করিবেন।

২য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। ১৩০৬ আশ্বিন ও কার্ত্তিক। সেপ্টেঃ, অক্টোঃ ১৮৯৯।

বিবিধ সংবাদ।

পদত্যাগ—শ্রীযুক্ত রায় পশুপতি নাথ বসু, কুমার শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু নলিন বিহারী সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাচরণ পাল প্রভৃতি কলিকাতার বহুসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের মন্তব্যে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনরের পদ অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্মানের পদ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া সহরের কত মহোদয় কতই না যোগাড়-যন্ত্র করিয়া থাকেন! সুতরাং এই ত্যাগস্বীকারে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের বাহাদুরী আছে বটে।

মশকে ম্যালেরিয়া—কোনও ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ্ ব্রিটিশমেডিকেল নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মশকের দংশনের সহিত ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহা না কি তিনি বহুস্থলে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর এক ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মশকেরা দূষিত রক্ত শোষণপূর্ব্বক মনুষ্যদেহের উপকার করে। আমরা এতদুভয়ের কোন্ মতটী মানিব বুঝিতে পারি না।

তথ্য নির্ণয়—সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত কোন ত্রয়োদশবর্ষ বালকের তিন-মাস অন্তর একবার ভয়ানক মূর্চ্ছা ও সঙ্কটাবস্থা হইত। কোন প্রসিদ্ধ কবি-রাজ এ রোগীকে প্রথমে বাতব্যাধির 'ছাগলাদ্য ঘৃত' ও পরে অপস্মার রোগের

'মহাচৈতস ঘৃত' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল হয় নাই। পরিশেষে রোগী আমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ায় বাল্যচপলতা দোষ থাকিতে পারে অনুমান করিয়া তদুপযোগী বৃষ্য ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম; তাহাতেও ফল হইল না। তখন আরও নিপুণভাবে কারণ খুঁজিতে লাগিলাম—রোগীর অন্য কোন রোগ নাই, শরীর এক রকম নধর ও কান্তিমান্। সর্ব্বশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় এইরূপ ঔষধ দিলাম। ইহাতেই রোগ দূরীভূত হইল। উপর উপর চেহারা ভাল থাকিলেও মানুষের আগুনের ঘরে অলক্ষিতে এমনই ত্রুটী থাকে!

এ কালে রাক্ষস—আফ্রিকা দেশে প্রকাণ্ড-মূর্ত্তি বিকট-দর্শন এক জাতীয় মনুষ্য আছে। নরমাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। জীবিত মনুষ্য না পাইলে ইহারা শব ভক্ষণ করে। ইহারা অশিক্ষিত অজ্ঞান পশুবৎ; কিন্তু আমাদের দেশেও কোন সুশিক্ষিত রাজা শিশু ভক্ষণ করিতেন এবং তান্ত্রিক যোগিগণ শ্মশানের শব লইয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকেন। এ অতি উদ্ভট ধর্ম্মপথ।

চিকিৎসা-সঙ্কট—ভদ্র পরিবারস্থ কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রজঃস্রাব হইতে হইতে ক্রমে অতীব অবসন্ন মৃতপ্রায় অবস্থা উপনীত হইল, ডাক্তারী চিকিৎসার চূড়ান্ত হইল কিন্তু রক্তরোধ হইল না। পরে আমরা আহুত হইলাম। দুই পূরিয়া ঔষধ দিতেই রক্ত বন্ধ হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় (বোধ হয় রক্ত ঊর্দ্ধ হইয়া) রোগিণীর মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ আরম্ভ হইল। এই মূর্চ্ছা শান্তির জন্য বায়ুনাশক ঔষধ ও তৈল দিতে দিতে রোগীণীর জ্বর দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ। তখন জ্বরের মৃদু ঔষধ দিতে গেলেও বায়ুর প্রকোপ এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। বায়ু অধোগ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কোন উপসর্গই যাইবে না মনে করিয়া বিরেচক বটিকা দিলাম। ইহাতে দাস্ত না হইয়া বমি হইয়া উঠিয়া গেল, তারপর যত ঔষধ বা পথ্য দেওয়া যায় সমস্তই উঠিয়া যায়, কিছুই পেটে থাকে না। রোগিণী ক্রমে অনাহারে অতীব ক্ষীণ, স্পন্দশক্তি-বিহীন হইল। জ্বর, বমি, কোষ্ঠবদ্ধ, তলপেট ব্যথা, মূর্চ্ছা ও আত্যন্তিক দুর্ব্বলতা এই কয় উপসর্গ যেন পরস্পর পরামর্শ করিরা রেগিণীকে শমনালয়ে লইয়া যাইতে প্রস্তত। তখন গৃহস্থ আমা-

দ্বারা আর কাজ হইবে না মনে করিয়া কোনও (নামে ও ধনে বড়) কবিরাজকে ডাকিলেন। তিনি হঠাৎ আসিয়াই সব বুঝিবেন—সাধ্য কি? যে কয়দিন রোগিণী তাঁহার হাতে ছিল ক্রমে আরোই রোগবৃদ্ধি। আমি পুনরায় আহূত হইলাম, এ বারে সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল স্বর্ণসিন্দুর ও একটী পাচনের জল এবং দুই এক চাম্‌চে বার্লী দেওয়া হইতে লাগিল। ভগবৎ-কৃপায় ক্রমে সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়া রোগিণী দেড়মাস পরে আরোগ্যের পথে দাঁড়াইল এবং তিনমাস পরে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল। রোগী অনেক ঔষধ খাইলে, অবশেষে পাচনের দ্বারাই অধিক উপকার হয়।

যজ্ঞানুষ্ঠান—সে কালের হিন্দু রাজারা রাজ্য-মধ্যে কোনও অশুভ লক্ষণ দেখিলেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে পান ভোজন করাইয়া রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতেন। এখন সে কালও নাই, হিন্দুর সে মনও নাই। কেবল বাড়ীর গৃহিণীদের কৃপাতেই "লক্ষ্মীপূজা" প্রভৃতি হিন্দুর নিত্যক্রিয়া গুলি এখনও বাজে খরচ বলিয়া বন্ধ হয় নাই, সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, এ বৎসর না কি সাতটি গ্রহের একত্র সমাবেশ হইবে। হিন্দুশাস্ত্র-মতে ইহা দেশের ও প্রাণী মাত্রেরই অমঙ্গল সূচক। সেই অমঙ্গল দূরীকরণার্থ লাহোরে এক বিরাট যজ্ঞ হইবে; তাহার আয়োজন হইতেছে। কাশীর বড় বড় পণ্ডিত আনাইয়া এ যজ্ঞে ব্রতী করা হইবে। যজ্ঞের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মের গতাবশেষ ক্রিয়া কলাপ এখনও কিছু কিছু পশ্চিম প্রদেশেই আছে!

ভূতও অদ্ভুত—আমেরিকার যখন সকলই অদ্ভুত, তখন ভূত অদ্ভুত না হইবে কেন? সেখানে নাকি এক রকম সর্পাকৃতির ভূত আছে; তাহার আবার ঘোড়ার মত মাথা, পায়ে খুর, খাঁজকাটা ল্যাজ, ছাইয়ের মত রং, ও চামচিকার মত পাখা আছে। ইহার উপদ্রব আরও অদ্ভুত—সে নাকি ঘোড়ার পা খোঁড়া করে, গরুর দুধ কমিয়ে দেয়, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে! তা না হবে কেন? এ কি দেশী ভূত, যে দেশী উপদ্রব করবে?

রাজার দয়া—বোম্বে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতীকার চেষ্টার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়াছেন; ঐ আফিস সম্প্রতি পুনায় আছে! এ সংবাদে তত্রত্য দরিদ্র লোকদিগের প্রাণে আশার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে।

কালিদাস-কীর্ত্তি—লণ্ডনে এলিজাবেথান্ ষ্টেজ সমিতি নামে একটী নাট্য সম্প্রদায় আছে, সেখানে সম্প্রতি কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয় হইবে সংকল্প হইয়াছে! পরাজিত ভারতের রত্নগুলির মাহাত্ম্য বুঝিবার লোক বিলাতেও আছে। এমন কি কোনও ইংরাজ গ্রন্থকার শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ মাত্র পড়িয়া বলিয়াছেন—যদি কেহ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ছবি একাধারে দেখিতে চান, যদি বসন্তের দেবদুর্লভ পুষ্পরাশির অনুপম সৌরভে প্রাণ মাতাইতে চান্ তবে আমি শকুন্তলার নাম করিব।

স্ত্রীলোকের দান—মানভূমপুরুলিয়ার ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী কাদম্বিণী দেবী, মৃত স্বামীর স্মৃতি সংরক্ষণার্থে গবর্ণমেণ্টের হাতে ৪০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকায় তত্রত্য দরিদ্র ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দেওয়া হইবে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; অপিচ রমণীহৃদয়ের এতাদৃশ উদারতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শতশত ধন্যবাদ দিয়াছেন।

সদ্‌বুদ্ধি ও সদ্দান—বরাহনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত জমিদার শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য দুইজন লেখককে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সতীত্বের তেজঃ—পশ্চিম প্রদেশে কোনও সম্ভ্রান্ত লোক স্বীয় সুন্দরী স্ত্রীকে স্বগৃহে লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে দারোগাপ্রভু কামান্ধ হইয়া বলে "এ স্ত্রী যে তোমার তাহার প্রমাণ কি?" ভদ্র লোকটী প্রমাণের জন্য শ্বশুরালয়ে পুনরায় যাইতে বাধ্য হন্। ইত্যবসরে অসি-সজ্জিত হইয়া দারোগা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলাৎকারে প্রবৃত্ত হয়। অমনি সুন্দরী সতীত্বের উদ্দাম পরাক্রমে পাষণ্ডের অসি লইয়া তাহারই মস্তক ভূমিসাৎ করিল। কোর্টের বিচারক এই স্ত্রীকে দণ্ড না দিয়া বরং চারিশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। ধন্য সতী! ধন্য বিচারক!

দান ও উদারতা—পুঁটিয়ার শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণী হেমন্তকুমারী রাজসাহী কলেজের সম্পর্কে একটী, ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণের জন্য ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আগমনী।

চন্দ্রমা মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া, আর ত সেই মলিনমুখে তেমন মিটি মিটি অস্ফুট হাসিটি হাসে না! আর ত মেঘ তেমন করিয়া অবিরল জল ঢালিয়া ধরাতল বিপ্লাবিত করে না! ঘনঘোর বজ্রনির্ঘোষে বিশ্বসংসার আর ত এখন তেমন সন্ত্রাসিত হয় না! তবে তোমার ও অশ্রান্ত উত্তাল নৃত্য-তরঙ্গের গতিভঙ্গ হয় না কেন মা? প্রশান্তরূপিণী প্রকৃতির পবিত্র কলেবর কেবল আজ তোমারই পঙ্কিল-সলিল-সংস্পর্শে কলঙ্কিত কেন মা? সুখদ-শারদ-সমাগমে শান্তিসৌন্দর্য্যের আনন্দমন্দিরে এ সংসারের অশান্তি উদ্‌ভ্রান্তি সকলই ত ধীরে ধীরে লুকাইয়া গেল, তবে তোমার ও প্রচণ্ড তাণ্ডব-কাণ্ডের শেষ-যবনিকার কণিকাও দেখি না কেন মা?

কুল্ কুল্ কুল্! কিছুই বুঝিলাম না ত? ও কি কথা মা? যখনই জিজ্ঞাসা করি—কুল্ কুল্ কুল্! ওর অর্থ কি মা? মানে না বুঝিলেও তোমার ওই মধুমাখা কথাটি কানে যেন কত অমৃত ঢালিয়া দেয়, ভাব না বুঝিলেও প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়। এমনই বা হয় কেন মা? না বল, আমি কিন্তু বুঝিয়াছি—এই অকূল দুঃখসাগরে ভাসমান কুলাঙ্গার কুমার-কুলের কাতর-ক্রন্দনে, সেই কৈলাসবাসিনী কৈবল্যদায়িনী কুলকুণ্ডলিনী মায়ের আমার কোমল প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের এ অকূলে কূল পাইবার কাল অতি নিকটে আসিয়াছে, তাই তুমি আজ আহ্লাদে আকুল হইয়া এমন ব্যাকুলভাবে দু'কূল বিপ্লাবিত করিয়া, কুল কুল কোলাহলে কলনাদিনী করুণাময়ী মা আমার! এই শুভ সমাচার প্রচারের জন্য দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছ।

যাও মা! কিন্তু ও আবার কি? প্রবাসী পুত্র প্রাণের ব্যগ্রতায় তীর-তীব্রগতিতে তরী ছুটাইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়াছে—অনেক দিনের পর মাকে দেখিবে বলিয়া। আর তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে তরল-তরঙ্গে, গঙ্গে! এমন খরতর ভাবে, তরতর রবে, ছুটিয়াছ কেন মা? যেখানে আজ তরণীর তড়িদ্ গতি, সেখানেই তোমার তরতর গীতি! আরোহীকে ও কি কথা বলিয়া দিতেছ মা?

"তর্ তর্ তর্—এ সামান্য নদী কেন? এই অপার সংসার সমুদ্রটা এই বেলা তোরা তর্ তর্ তর্। তরিবার সময় আসিয়াছে,—তোদের ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণধারিণী, ত্রিলোক-তারিণী জননী, আজ তোদের জন্য করুণার কৈবল্য-কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন,এই বেলা তোরা—তর্ তর্ তর্। এমন সুযোগ এত সুবিধা ছাড়িস্ না রে তর্ তর্ তর্। এই সময়, সময় থাকিতে, শক্তি থাকিতে, সামর্থ্য থাকিতে—তোরা সবে তর্ তর্ তর্।"

এই না তোমার তর্ তর্ রবের ভাবার্থ মা? আমরি মরি! এত স্নেহ, এত দয়া, এমন মমতা, মা বিনা আর কোথায় সম্ভবে? এখন বেশ্ বুঝিয়াছি মা! নৈশ-নিবিড়-তমস্তরঙ্গ বিলোড়িত করিয়া, কাদম্বিনী সহচারিণী সৌদামিনী কেন আর তেমন প্রচণ্ড প্রলয়কাণ্ডের অভিনয়ে অগ্রসর হয় না। জলভর-মন্থর জলধরের সান্দ্রমন্দ্র জীমূত-নির্ঘোষে কেনই বা আর কর্ণকটাহ ফাটিয়া যায় না, আর কেনই বা বায়ুর বিশ্ব-বিধ্বংসী বিশাল বেগ বিলুপ্ত প্রায়!

এখন বুঝিয়াছি—মৃদুমন্দ সান্ধ্য-সমীরণ-হিল্লোলে ঈষদান্দোলিতা ললিতা লতা, উপর্য্যুপরি ঘন-বিন্যস্ত স্তবকিত কুসুমসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিয়া, আনন্দে দুলিয়া, অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যচ্ছটায় কেন আজ হৃদয় মন ভরিয়া দেয়। কেনই বা, পুলকাকুল-কোকিল-কুলের কলকোলাহলে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর পুঞ্জের হৃদয়রঞ্জন গুঞ্জনে, পাপিয়ার পীযূষপূর্ণ প্রমোদতানে, মর্ত্ত্যতল আজ কিন্নরনগরের গরিমার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেনই বা, চূতচম্পক-বকুল-কদম্ব-তরুরাজীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামললোহিত দল-পল্লব-পুঞ্জে, পৃথিবী একটি কমকুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। কেনই বা চন্দ্র অমল-উজ্জ্বল-কিরণকলাপে গগণতল এত আলোকিত করিয়াছে। মুক্তাবিনিন্দিত-শিশিরবিন্দুসিক্ত, তরুণারুণ-কিরণরঞ্জিত কমলদল, কেন আজ মৃদুল হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। আর তুমিই বা কেন এমন উদ্দাম-আনন্দ-আবেগে অধীর-উন্মাদিনী সাজিয়া, উধাও-উদ্‌ভ্রান্ত-গতিতে দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছ, আর বলিতেছ—"কুল্ কুল্ কুল্, তর্ তর্ তর্"।

আনন্দময়ী মা আসিতেছেন, তাই আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আনন্দ-উৎসবের অমৃত উৎস উৎসারিত হইয়াছে। আনন্দে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণ আজ উদ্বেল-আনন্দ-তুফানে ভাসিতেছে।

কিন্তু জানি না—এ আনন্দ স্বাপ্নিক কল্পনার ক্রীড়া-কন্দুক কি না! প্রভাত-বাত-বিলোড়িত জলদপটলের বিকট-কঠোর গর্জ্জনের মত, ইহা বিফল ও পরিণাম-শ্লথ কি না!

শ্মশান-সৈকত যাহাদের সাধের সুখশয্যা, মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুই যাহাদের একমাত্র প্রার্থনার বিষয়, অশ্রুজল যাহাদের চিরসম্বল, হাহাকার আর্ত্তনাদই যাহাদের সান্ত্বনার শান্তিসূত্র; অতৃপ্তি অশান্তিই যাহাদের আদরের অর্দ্ধাঙ্গিণী; রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যই যাহাদের চিরসহচর, সে সব হতভাগ্যদের দগ্ধহৃদয়ও আজ যেন থাকিয়া থাকিয়া কেমন করিয়া উঠে, তাই বড় ভয় হয়—"অত্যুচ্চৈঃ পতনায় চ" কি না!

হাঁ মা! সত্যই কি তুমি আসিবে? সচ্চিদানন্দময়ীর শুভসমাগমে সত্যই কি সংসার আবার অপার আনন্দ তুফানে ভাসিবে? সত্যই কি এ নির্ম্মম মহাশ্মশান, নন্দনবনে পরিণত হইবে? সত্যই কি তুমি নিরন্ন শীর্ণ সন্তানগুলির শুষ্কমুখে অন্নপূর্ণারূপে আবার আদরে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিবে? কি করিয়া বিশ্বাস করিব? কঠোরাদপি কঠোরতর তপঃসাধনায়, কত কত কোটি কোটি কল্প কল্পান্ত কাল কাটিয়া যায়, কত কত যুগ যুগান্ত জন্ম জন্মান্তর অতীত হয়, তথাপি শত শত যোগী যোগীন্দ্র যাঁহাকে "স্বান্তং প্রশান্তমবধর্ত্তুমলং ন শান্তাঃ"; আমাদের এত কি সৌভাগ্য যে, আজ অযত্নে অনায়াসে সেই শঙ্করসর্ব্বস্ব সুরারাধ্য ধনের অধিকারী হইব? সেই বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দিতচরণারবিন্দ সন্দর্শনে, জীবন মন ধন্য করিব? তিতিক্ষা-দীক্ষা-শিক্ষাশূন্য, রোগ-শোক-সমাকীর্ণ, পাপ-তাপ-পরিপূর্ণ, এই নগণ্য নারকিকুলের এ সৌভাগ্যগরিমা একান্তই অসম্ভব নয় কি মা? অসম্ভব—অতি অসম্ভব—একেবারে আশার অতীত। কিন্তু মা! তোমার রাজ্যে, তোমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অহৈতুকী করুণার নিকটে, সংসারের সকল অসম্ভবই সম্ভাবিত। আমরা যতই অশান্ত, অদান্ত, ঘোরনারকী, মহাপাতকী, হই না কেন মা! তোমার সেই অপার অনন্ত করুণার ধারায় সব যে ধুইয়া যায়! তুমিই না বলিয়াছ—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোপি সংসার দুঃখৌঘৈ র্বাধ্যতে ন কদাচন॥"

জীব যত পাপই করুক না কেন, যদি একবার অনন্যমনে তোমার

চরণে শরণ লয়, তুমি সযত্নে সংসার হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দাও। তাই তোমার নাম পতিত-পাবনী। কিন্তু করুণাময়ি মাগো! আমরা দিনান্তেও ত দীনতারিণীকে ডাকি নাই, প্রাণান্তেও ত পতিতপাবনীর পদপ্রান্তে শরণাপন্ন হই নাই, তবে তোমার "এ অভয়-আশ্বাসে আমাদের আশা কৈ মা? আমাদের উপায় কি মা? উপায় কি তবে নাই. অবশ্য আছে,—

"মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি"

আমাদের ন্যায় পাপী জগতে নাই বটে সত্য, কিন্তু তোমার মত পাপ-নাশিনীও ত আর সংসারে দেখি না। তাই আবার আশাও হয়—অসম্ভব হইলেও তোমার এ করুণায় আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না! এস মা! তোমার ঐ অহৈতুকী করুণার বিমল গঙ্গাজলে, সংসার-মলীমস-সমাচ্ছন্ন অশান্ত সন্তান-কুলকে নির্ম্মল করিয়া কোলে তুলিয়া লও, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠিয়া, মা মা বলিয়া জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা সব ভুলিয়া যাই। দিদিমা, খুড়িমা, পিসিমা, মাসিমা, এ সব উপাধিগুলি বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল এক অখণ্ড বিশ্বময়ী মহামাতৃসত্তায় আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া থাকি। মাময় জগতে জগন্ময়ী মাকে দেখিয়া যেন যথার্থই বলিতে পারি—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।"

এস ভারতের নরনারী! আজ আমরা দুঃখ দারিদ্র্য ভুলিয়া গিয়া দুর্গতি-দমন দুর্গানামের বিজয়-বৈজন্তী গরবে গলায় পরিয়া, অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও জগদেক-জননীর সন্তান বলিয়া সংসারে পরিচিত হই। সুরাসুর-কিন্নর-নরের আরাধ্যধনকে হৃদয়ে ধরিয়া, মৃত্যুঞ্জয়-হৃদয়-রঞ্জিণীর মণিমঞ্জীর-শিঞ্জিত চরণাম্বুজে সচন্দন জবাঞ্জলি দিয়া জন্মজীবন ধন্য করি। আর কোটি কোটি কণ্ঠ একত্র করিয়া সকলে মেলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলি—

"এহ্যেহি ভগবত্যম্ব! শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে!
আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি! সর্ব্বকল্যাণহেতবে"।

শ্রীযতীশচন্দ্র শাস্ত্রী।

নিদ্রা ও চন্দ্রকোক্তি।

তমোভবা শ্লেষ্মসমুদ্ভবা চ মনঃশরীরশ্রম-সম্ভবা চ।
আগন্তুকী ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী চ রাত্রিস্বভাব-প্রভবা চ নিদ্রা ॥

সূত্রস্থান।

নিদ্রা ষট্ প্রকার। প্রথম—তমোগুণ সম্ভবা। যাহারা কেবল খায় দায়, নিদ্রা যায়, আহার মৈথুনাদি অজ্ঞান-পশুসুলভ কয়েকটা দৈনন্দিন অভাব-পূরণ ব্যতীত যাহাদের জীবনের আর বড় কিছু উদ্দেশ্য নাই, সেই সমস্ত তামসিক প্রকৃতিক ব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ চিরপ্রিয় নিদ্রালুতা, তাহাই এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয়—শরীরস্থ শ্লেষ্মধাতুর আধিক্য বশতঃ। যাঁহাদের ধাতু কফপ্রধান, যাঁহারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ তাঁহাদেরই এই দ্বিতীয় প্রকার নিদ্রা হইয়া থাকে। তৃতীয় নিদ্রা—পরিশ্রম জনিত। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বা দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অত্যধিক চালনা বশতঃ যে গ্লানিকর ক্লান্তি উপনীত হয়, তাহাই অপনোদনের জন্য এই নিদ্রা মঙ্গলময়ের এক অভাবনীয় অনুপম সৃষ্টি! এ নিদ্রা বড় মধুর, বড় তৃপ্তিপ্রদ,—শ্রমতাপিত দেহের কেমন যেন এক অপূর্ব্ব সুখনির্ঝরিণী। জীবিকান্বেষণে উত্তমাঙ্গের ঘর্ম্মধারা যাহার পদোপরি প্রস্রুত হয় নাই, সে এই সুখের স্বাদ কি বুঝিবে? চতুর্থ প্রকার নিদ্রা—"আগন্তুকী" নামে অভিহিত। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে নিদ্রা কোনও ঔষধ, পথ্য বা প্রক্রিয়া বিশেষের প্রয়োগ দ্বারা আনয়ন করা হয় তাহাই এই চতুর্থ শ্রেণীর।—যেমন অহিফেন, দধিযুক্ত সুশুনি-শাকের অম্ল বা মস্তকে শীতল জল সেচন ও তদুপরি ব্যজন বায়ু প্রভৃতি দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ। এই জাতীয় নিদ্রা আকস্মিকীও হইতে পারে, যেমন অজ্ঞাতসারে কোন বিষ বা মাদক বস্তু উদরস্থ হইলে সংজ্ঞার অপগম দৃষ্ট হয়। পঞ্চম প্রকার নিদ্রা—ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ কোনও রোগের স্বভাব হইতে উৎপন্ন। অনিদ্রা যেমন কোন কোন রোগের উপদ্রব, অতিনিদ্রাও তেমনি রোগবিশেষের উপসর্গস্বরূপ উপনীত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ প্রকার নিদ্রা—রাত্রি-

স্বভাবপ্রভবা। নিশা সময়ের এমনই প্রকৃতি যে, তৎসময়ে অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই নিদ্রাদেবীর সংমোহন আবেশে অভিভূত হইয়া থাকে।

যখন তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যদেবের বিশ্রান্তির পর, তৎপ্রতিনিধি প্রদীপাদি-সম্ভূত আলোকেরও পর্য্যায়ক্রমে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয় ও দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন, জগৎ নিঃশব্দ নিঃস্তব্ধ হইয়া পড়ে, তখন নিদ্রা নিজমূর্ত্তির সহিত জাগতিক মূর্ত্তির সামঞ্জস্য দেখিয়া অযাচিত অনাহূত ভাবে স্বয়ংই জীবদেহে আশ্রয় লইয়া থাকে।

রাত্রিস্বভাব-প্রভবা মতা যা
তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিদ্রাং।
তমোভবা মাহুরঘস্য মূলং
শেষং পুন র্ব্যাধিষু নির্দ্দিশন্তি।—সূত্রস্থান।

যে নিদ্রা রাত্রিস্বভাবসুলভ তাহাই ভূতধাত্রী অর্থাৎ জীবগণের পালয়িত্রী নামে আখ্যাতা। এই নিদ্রাই দেহের পুষ্টিসাধনী, মনের স্থৈর্য্যবিধায়িনী এবং জীবকুলের জননীর ন্যায় পরম হিতকরী। আর যে নিদ্রার কারণ তমোগুণাধিক্য তাহা পাপের মূল এবং অগণিত অনিষ্টের আকর-স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সমস্ত নিদ্রাই (অর্থাৎ আগন্তুকী, শ্লেষ্মসম্ভূতা, ও ব্যাধ্যনুবর্ত্তিনী এই তিনই) ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত, যেহেতু, এই তিন প্রকার নিদ্রা হইতেই দৈহিক কষ্টানুভব হইয়া থাকে।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলং।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানম্ অজ্ঞানং জীবিতং ন বা॥—সূত্রস্থান।

পূর্ব্বোক্ত নিশাসুলভা ভূতধাত্রী নিদ্রার উপরেই মনুষ্যের সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, বীর্য্যবত্তা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ নির্ভর করে। বস্তুতঃই নিদ্রাসুখ মনুষ্যের সম্ভোগার্হ বিষয় সমুদায়ের মধ্যে প্রধানতম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদি একদিন অভ্যস্তকালাপেক্ষা একটু বিলম্বে নিদ্রা হয়, তবে শরীর ও মনের যে কি অবস্থা হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আবার যদি সমগ্র রাত্রিটী এককালীন নিদ্রাদেবীর প্রসাদ-প্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে যে কত যাতনা হয় তাহার

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উপর্য্যুপরি কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে নিদ্রালেশবর্জ্জিত হইয়া নিশাযাপন করিতে হইলে যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা অবর্ণনীয়—অতীব লোমহর্ষণ—মনে করিতেও প্রাণ চমকিয়া যায়। শুনা যায় কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে কারাগারে পূরিয়া অপরাধের তারতম্যানুযায়ী পাঁচ সাত দশ বা ততোধিক রাত্রি পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রাখা হইত এবং বিন্দুমাত্র নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইবামাত্র, প্রহরীর লগুড়াঘাতে তাহা অপসারিত করা হইত! পাঠক! মনে হয় না কি যে, এই দণ্ড বিষ, অস্ত্র বা উদ্বন্ধন অপেক্ষাও ঘোরতর!

নিদ্রা শরীরের পুষ্টিজনক; ঘৃত দুগ্ধ মাংসাদি সহস্র বলকর আহার্য্যের নিত্যাভ্যাস থাকিলেও নিদ্রা ব্যতিরেকে কদাপি শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না।

আহার্য্যকর্তৃক দেহপুষ্টি না হইলে শুক্রধাতুর সঞ্চারও যথামাত্রায় হয় না—সুতরাং শুক্রের হ্রাসহেতু ক্রমে পৌরুষশক্তির হানিও হইতে পারে। অন্যান্য শারীর যন্ত্রের অপেক্ষা মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা নিদ্রার সাহায্যাপেক্ষী; যেহেতু, সমস্ত যন্ত্রেরই মধ্যে মধ্যে ন্যূনাধিক বিশ্রাম আছে, কিন্তু উক্ত যন্ত্রের ক্রিয়া অবিশ্রান্ত—কারণ মনুষ্যের চিন্তাস্রোতঃ সর্ব্বদাই বহমান। নিদ্রাব্যতীত চিন্তার বিরতি নাই—মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম নাই। সুতরাং অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতায় ক্রমে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ বা উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়।

অনিদ্রা দ্বারা বায়ুবৃদ্ধি বা স্নায়বিক উত্তেজনার আতিশয্য, তৎসঙ্গে পিত্তেরও প্রকোপ হইয়া থাকে। বায়ু ও পিত্ত যুগপৎ কুপিত ও একত্র মিলিত হইয়া সমীরণসহকৃত প্রচণ্ড অগ্নির ন্যায় শরীরস্থ সপ্তধাতুকে দগ্ধ করিয়া ফেলে—এ অবস্থার পরিণাম মৃত্যু। সুনিদ্রা দেহমন্দিরের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। অপি চ সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান লক্ষণ।

(ক্রমশঃ)

আশা বৈতরণী নদী।

বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি "আশা বৈতরণী নদী" অর্থাৎ বৈতরণী নদীর যেমন আদিঅন্ত নাই আশার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আশার

ছলনায় একবার পড়িলে তাহার হস্ত এড়ান দুঃসাধ্য। আশা যতই ফলবতী হউক না কেন, তাহার দৈর্ঘ্য কিছুতেই হ্রাস হয় না।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন পঞ্চ পাণ্ডবকে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক স্বয়ং একমাত্র ধরণীশ্বর হইবার আশায় বুক বাঁধিয়া কুরুপাণ্ডবের মহাসমরের সৃষ্টি করিয়া অগণ্য ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়া শেষে শত ভ্রাতা সহ নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হায়, কোথায় তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ! আশার ছলনায় তাঁহার কি সর্ব্বনাশই সংঘটিত না হইল!!

মহারাজ যযাতি পুত্রের যৌবন লইয়া সহস্র বর্ষ সুখসম্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক আশার সীমা নাই। ঘৃত সংযোগে অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, মানব হৃদয়ে আশা তদ্রূপ প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহারাজ যযাতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

বস্তুতঃ আশা অকূল পাথার; তাই ইহার অপর নাম "বৈতরণী নদী"। আশার মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণে জীবহৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। বিবাদ বিসম্বাদ মারামারি কাটাকাটি খুনখারাপি দানখয়রাত জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে তৎসমুদায়ের মূলই আশা। একদিকে আশা মানবহৃদয়ে যেমন উত্তপ্ত দাবানল জ্বালিয়া দেয়, অপরদিকে তদ্রূপ প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। আশা না থাকিলেও মানবের পক্ষে জীবনধারণ করা দুরূহ হইত। একটি উপযুক্ত উপার্জ্জনশীল পুত্র কালকবলে পতিত হইল, অমনই পিতা মাতা তাঁহাদের পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্রটির প্রতি কত আশা করিয়া তাহার মুখ চাহিয়া রহিলেন; আশা—পুত্র কালে 'দশের এক' হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে।

বর্ত্তমান বর্ষে অনাবৃষ্টিতে কৃষকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইল কিন্তু তবুও হতাশাস হইল না, আগামী বর্ষে সুবৃষ্টির আশায় রহিল। যথাসময়ে সুবৃষ্টির সমাগমে দ্বিগুণ উৎসাহভরে কৃষকবর্গ কর্ত্তব্যক্ষেত্রে খাটিতে লাগিল; কিন্তু হায় সবই বিফল; অতিবৃষ্টিতে এ বার কৃষকগণের অনন্ত আশা কোথায় ভাসিয়া গেল,

সকলেই মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই আপার মোহন বংশীধ্বনি শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া আগামী বর্ষের প্রতীক্ষায় রহিল। আশা আর ফুরায় না—তাই বলিতে হয় আশা বৈতরণী নদী। কিন্তু হোক তাহা 'বৈতরণী নদী', তা বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিও না। আশা না থাকিলে মানবের দগ্ধজীবন কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত!!

আশা তিন ভাগে বিভক্ত যথা আশা, দুরাশা, নিরাশা। বর্ত্তমানযুগে আমাদের আশা, দুরাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই তাহার তীব্র উত্তাপে আমাদের হৃদয় ঝালসাইয়া যাইতেছে। অধুনা কলু, তাঁতী, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সকলে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া একটা কিছু (অর্থাৎ ডেপুটী বা তদ্বিশেষ) হইবার প্রত্যাশায় আকুল হইয়া শিক্ষালয়াভিমুখে ধাবমান হইতেছে। কলু ঘানি বেচিয়া, কৃষক তাহার বহুকষ্টসঞ্চিত লাঙ্গল খানি বেচিয়া, পুত্রের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিল; পুত্র যথাসময়ে দুই কলম ইংরাজি শিখিয়া হ্যাট্‌কোট আঁটিয়া চুরট বার্ডসাইয়ের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিজের পদবীতে পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত হইয়া শ্যামা কলু লিখিতে আরম্ভ করিলেন 'শ্যামচরণ দাস'। হরে ধোবা লিখিতে শিখিলেন 'হরিচরণ দেব'। আর সেই শিক্ষিত পুত্রদের মাতা পিতা পৈত্রিক রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া চলাতে পুত্রগণ নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া Oldfool বলিয়া তাঁহাদিগকে Don't care করিলেন। শিক্ষার ফল ত এই! মাতা পিতা বহু আশা করিয়া যে পুত্রের শিক্ষার্থে সর্ব্বশ্বান্ত হইলেন, সে পুত্রের অবস্থা ত এই! কিন্তু এমন কেন হয়? বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে দুরাশার ফল বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইবার আশা করা দুরাশা মাত্র। অধুনা সকলেরই ধারণা—শিক্ষা কেবল চাকরী করিবার জন্য; সুতরাং "শুকপাঠ" গোচ চাকরীর উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া সকলেই নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে ছুটিলেন। অনেকেই তাহাতে হতাশ্বাস হইয়া "ইতঃ ভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট ন চ পূর্ব্বো ন চ পরঃ" গোচ হইয়া রহিলেন। শিক্ষিত আজকাল সবাই—কিন্তু রাজসরকারে এত চাকরী কোথায়, তাহা একবার কেহ ভাবিয়া দেখিবেন না। আজকাল শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাত্র চাকরী করা, সুতরাং তাহাতে নিজধর্ম্মানুশীলন বা কর্ত্তব্য শিক্ষা

কিছুমাত্র হয় না। এমত অবস্থায় উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। এই দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র ও কর্ত্তব্যানুশীলন সহ যদি সকলে নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন, তবে স্বীয় জীবনের ও অবস্থার উন্নতি হয়! অধুনা আমাদের দেশীয়গণ সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত বিদেশীয় ব্যবসায়ীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে! স্বর্ণপ্রসূ ভারতের অধিবাসিগণের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য বিদেশীয়গণ বস্ত্র আনিয়া যোগাইতেছেন। বলিহারি ভারতবাসীর শিক্ষা! বলিহারি তাঁহাদের অপূর্ব্ব রুচি!!

দুঃখের বিষয় এই, দুরাশা পুরুষহৃদয় করতলগত করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। রমণীদিগের কোমল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরও মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে যে বাড়ীর কর্ত্তা থানফাড়া পরিয়া কাটাইয়াছেন, আজ সেই বাড়ীর পুত্রবধূর ফরাসডাঙ্গার ধুতি না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, তাঁহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না।

গৃহিণীগণ আর সংসারের কার্য্য দেখিতে পারেন না। সন্তানপালন করিতে গেলে ঝঞ্ঝাটে তাঁহারা পীড়িতা হন, রাঁধিতে গেলে মাথা ধরে, কাজেই প্রতি গৃহে দাসদাসী চাই সুতরাং খোরাক পোষাক ৫।৬ টাকা মাহিনা দিয়াও দাসদাসী খুঁজিয়া মেলা ভার। কুড়ি টাকা মাহিনার একটি চাকরী খালি হউক, দেখিবে বিএ, উপাধিধারীর রাশি রাশি দরখাস্ত আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু আট টাকা মাহিনা স্বীকার করিয়া একজন পাচক খুঁজিয়া মেলা ভার হইবে। এই সমস্তই শিক্ষার ফল! আধুনিক শিক্ষা পূর্ণ ভাবে হইতেছে না, অর্দ্ধশিক্ষা হইতেছে মাত্র। আধখান বস্ত্র পরিধানে যেমন লজ্জা নিবারণ হয় না, তদ্রূপ অর্দ্ধ শিক্ষায় জীবনের উন্নতি হইতে পারে না। অর্দ্ধের কিছুই ভাল নহে! আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর প্রতি সমাজপতিগণের দৃষ্টি পতিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সমাজে অশান্তির ইয়ত্তা নাই—হিন্দুরমণী আজ ডাকের পুত্তলীবৎ গৃহ শোভাবর্দ্ধনের সামগ্রীমাত্র। যে হিন্দুরমণীর পবিত্র নাম ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যে হিন্দু রমণীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়, যে হিন্দুরমণী

"শ্রিয়েব স্ত্রী ন সংশয়ঃ", সেই হিন্দুরমণী আজ এ কি ভাবে বিরাজিত! ভারতের দুর্দ্দশার আর বাকী নাই। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও আমরা হিন্দুরমণীর মুখের দিকে কত আশা করিয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছি। ভরসা, তাঁহারা নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া আবার তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মপ্রাণতায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। তাহাদেরই গুণে সোণার ভারতে আবার সোণা ফলিবে। রমণীর এই অধঃপতনের দিনেও আমরা তাঁহাদের প্রতি নিরাশ হই নাই, কত আশায় বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি। তাই বলিতে হয় "আশাবৈতরণী নদী"!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

বিনোদিনীর কটাক্ষ।

বিনী'র বয়সের তুলনায় তার কটাক্ষের ব্যাসটা অনেক বেশী। ব্যাস কথাটা শুনিয়াই বোধ হয় অনেক পাঠক ওটাকে ব্যাসকূট ভাবিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। বসিবারই কথা বটে, কেন না জ্যামিতি শাস্ত্রটা পরীক্ষার পর হইতে অনেকেরই একেবারে জগন্নাথকে দান করা হইয়াছে কি না! তার উপর আবার কটাক্ষের ব্যাস। ওঃ কি বিরাট কল্পনা! যদি কটাক্ষের ব্যাস রহিল, তবে নিশ্চয়ই কটাক্ষ একটা তলক্ষেত্র? সন্দেহ কি? কিন্তু শুধু কি তলক্ষেত্র? কত অতল, বিতল, সুতল, ধরাতল, রসাতল ঐ কটাক্ষের তলস্থ। তুমি যোগী, আজানুলম্বিত শ্মশ্রুজালে তোমার কঙ্কালের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত, তুমি ষট্‌চক্রভেদ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সম্পর্ক ঘনীভূত করিয়া, নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত গিরিগহ্বরের এককোণে পাত্তরচাপা পড়িয়া আছ, কিন্তু আমার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বিনী'র পরীক্ষায় তোমার যোগ যাগ সব উড়িয়া গেল। বিনী'র যাই একটা কটাক্ষের রেখাপাত, অমনি কোথায় বা তোমার অনুত্তরঙ্গ অম্ভোধির গাম্ভীর্য্য! আর কোথাই বা তোমার অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের ভীতিমিশ্রিত প্রশান্তভাব! সবই যেন বাঁশপাতার তরলতা! সবই যেন শরতের উড়ন্ত মেঘ! ওঃ কি

কটাক্ষের তেজ কিন্তু! এই যে তোমরা দেবতা দেবতা কর, দেবভাব ও পশুভাবের তুলনায় তোমাদের মুখে যে উনপঞ্চাশ পবনের অধিষ্ঠান হয়, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের দশাটা ভাব দেখি। যাই মদন একটা হাওয়ার বাণ ছুঁড়িল, অমনি "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ"। শুধু কি তাই! "উমা-মুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি"। ছি, ছি কি বেয়াদবী! তুমি আমি—নরকের কীট, যে ভাবে অক্ষত যৌবনের প্রকালে, অপরি-তর্পণীয় লালসায় লেজেগোবরে জড়াইয়া থ হইয়া থাকিতাম, আজ বশী ব্যোমকেশ কি না সেই ভাবে, আমি শপথ করিয়া বলিতে সাহস করি, কালি-দাস সাক্ষী, ঠিক সেই ভাবে, আমাদের চেয়ে বরং এক ডিগ্রী বেশী হাড়-গোড় ভাঙা দ এর মত "দিশাং উপান্তেষু সসর্জ্জ দৃষ্টিং।" তবে চতুর-চূড়ামণি পঞ্চানন একটু চালাক কি না, তাই নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্ম ক্রোধে তালপাতার আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠেই "ভস্মাবশেষং মদনং চকার।" তাই না হয় হ'ক, মদন ছোঁড়া মরিল, পৃথিবী জুড়াইল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বয়াটে ছেলেগুলো বাপমায়ের বশীভূত হইল; ও হরি, কোথা থেকে এক সরস্বতী ভেসে এসে কি বোলছে শোন; রতি যখন কামের বিরহে একান্তই কাতরা, তখন আকাশবাণী তাহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন—

> কুসুমায়ুধপত্নি দুর্লভস্তব ভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।
> শৃণু যেন স্বকর্ম্মণা গতঃ শলভত্বং হরলোচনার্চ্চিষি ॥
> অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
> অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ ॥
> পরিণেষ্যতি পার্ব্বতীং যদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।
> উপলব্ধসুখস্তদাস্মরং বপুষা স্বেন নিয়োজয়িষ্যতি ॥

ভাবটা হইল এই—রতি তুমি কাঁদিও না, তোমার ভর্ত্তা বাঁচিবে। এক-দিন তোমার স্বামী, চারকেলে বুড়ো অস্তদন্তহীন পিতামহ ব্রহ্মাকে তামাসা করিয়া একটা ফুলের বাণ মারিয়াছিল। পিতামহের নির্ব্বাণোন্মুখ বুড়োধাতু কি না, তাই সেই কুসুম শরাঘাত সাজ্যাতিকরূপে এরূপ লাগিল যে সেই আঘাতে তাঁহার সেই চতুর্ব্বেদচিন্তাচন্দ্রিকাগ্রস্ত মস্তিষ্কটা তমোবহুল হইয়া "স্বসুতায়াং" কেমন একটা বিকৃতদৃষ্টি ফেলিয়া দিল। অমনি উঠিয়াই

মদনকে এক প্রকাণ্ড শাপ প্রদান। যেমন তুই আমাকে এমন করিলি, তেমনি তুই মহাদেবের চোখের আগুনে পুড়ে মর। সে দিনের ছোঁড়া তুই, তোকে হ'তে দেখলুম্, আমার সঙ্গে ফুল ছুঁড়ে ইয়ারকি? হা ভগবান্, তুমিই জান, প্রবৃত্তির ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়া কয়জন কয়েদী কারাবাসের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এখনও সরস্বতীর কথা ফুরায় নাই, আরও আছে। সরস্বতী রতিকে পতিমিলনের তারিখটা বলিয়া দিতেছেন, দেখ রতি, যে দিন শৈলসুতার সহিত মহাদেবের বিবাহ হইবে সেই দিন তিনি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তোমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দিবেন। হবেই ত—

"অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ।

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর মেঘ উভয়ই অশনি ও অমৃতের আধার। ভদ্রলোকের কি আর চিরকালই রাগ থাকে?—মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করাটাও তাঁদের অভ্যাস আছে। তবে অনুগ্রহটা স্বার্থশূন্য হইলেই লোকের কাছে প্রাণখুলে প্রশংসা করা যায় মাত্র।

হা অদৃষ্ট! মহাদেবের কথা প্রসঙ্গে আবার বুড়া পিতামহের কেলেঙ্কারীটে বাহির হইয়া পড়িল। যাঁর মুখের বাণী বেদ, যাঁর রচিত বিশ্বে বাসা বাঁধিয়া গরিব বেচারীর দিনগুজরান্ হয়, তিনিও আবার কম পাত্র নন্। কনিষ্ঠটী ছিলেন "শৈলসুতায়াং", তিনি আবার "স্ব-সুতায়াং"। কার কথা বা কাকেই বলি, কেই বা শোনে কেই বা বিচার করে।

ভ্রান্ত মন, কি বকিতেছ? তুমি যাঁহাদের কামুকতার কথা লিখিয়া কালী কলম কলুষিত করিতেছ, তাঁহারা যে "জগতঃ পিতরৌ", তাঁহারা যে "বন্দ্যৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ"! হউন না তাঁহারা "জগতঃ পিতরৌ", হউন না তাঁহারা "সহরস্য ভ্রাতরৌ", হউন না তাঁহারা "স্বর্গস্য গুরুতল্পশিষৌ", হউন না তাঁহারা ব্রহ্মলোকস্য "পিতাদুহিতরৌ", তাঁহারা লীলাময়ের করকল্পিত সাকার "স্ত্রীপুংসৌ" বই ত নয়! সুরেশই হউন আর নরেশই হউন, যে হউন না কেন The law must take its own way. আমি বিজ্ঞান লিখিতে বসিয়াছি, শরমের ঘোমটা দিলে চলিবে কেন? মেডিকেল কলেজ খুলিয়া বসিয়াছি, মড়ার গন্ধে ঘৃণা করিলে উপায় কি? ভগবানের আইন লিখিতে বসিয়াছি, রাজার বিষ্ঠাকে গোবর বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এ ত স্বভাবের নিয়ম!

এত বিনী'র উপর ভগবানের খোলা হুকুম। এই যে তুমি আমি পুরুষ জাতি, লম্ফে ঝম্ফে খোদ ভগবানের গায়ে পড়িয়া নিবাইয়া যাইতে উৎসুক, গয়লানীর দুধের হিসাব, চাকরাণীর পূজার বস্ত্র, তনয়ের চোখের চসমা এই সকলের প্রাণশোষিণী তালিকা দেখিয়াই দিনের মধ্যে দুই শতবার নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রশান্ত উৎসঙ্গে নিদ্রিত হইবার জন্য লালায়িত; যদি ভগবান্ বিনী'কে পাঠাইতে ভুলিতেন, তবে তাঁহার এই লীলাক্ষেত্র একবারে সাড়াশব্দহীন হইয়া যাইত। তাই লীলাময় ভগবান্ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বিনী'কে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিলেন, হে অচেতনে, ত্রিগুণে, বীজধর্ম্মিণি, প্রসবধর্ম্মিণি, অমধ্যস্থধর্ম্মিণি বিনোদিনি তুমি অবিলম্বে একাকিনী ধরাধামে গমন করিয়া চেতনাবান্, নিগু'ণ, অবীজধর্ম্মী, অপ্রসবধর্ম্মী, মধ্যস্থধর্ম্মী পুরুষ রাশিকে বলে হউক ছলে হউক কৌশলে হউক ভুলাইয়া রাখ। যখন তাহারা আমার লীলাগ্রন্থি ছিঁড়িতে উদ্যত হইবে, তখনই হে অচেতনে, একবার তাহাদের উপর কটাক্ষপাত করিবে মাত্র। অমনি দেখিবে তাহারা আমায় ভুলিয়া, তোমার জড়ভাবে চেতনা মিশাইয়া তোমারই চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। যেমন কুসুমে ভ্রমর, সেইরূপ স্ত্রীরূপে জীবজগৎ দিশা হারাইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। যেখানকার ফুল সেইখানেই থাকে, কিন্তু বেচারা অলির আর বিশ্রাম নাই। কেবল গুণ গুণ গুণ গুণ। পুরুষ নিগু'ণ পাগল, আশার দাস। সে ব্যোমযানের মত সরলপ্রাণে উন্মুক্ত পবনে, উদাসগগনে উড়িয়া বেড়াইতে উৎসুক। কিন্তু হে ত্রিগুণে, তুমি গুণময়ী বাসনা হইয়া, ব্যোমযানের বালির মত, লীলাক্ষেত্রেরই চারিদিকে তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে।

তুমি মাতৃভাবে তাহাকে সত্ত্বগুণে বাঁধিবে, জায়াভাবে তাহাকে রজোগুণে কাজ করাইবে, কন্যাভাবে তাহাকে তমোগুণে বিমুগ্ধ করিবে। সে আমাকে ভুলিয়া তোমারই উপর ভক্তি, প্রেম ও স্নেহধারা বর্ষণ করিলে, আমি দেখিয়াই সুখী হইব। আমি পুরুষে জগতের বীজ রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা কথার কথা মাত্র। তুমি ক্ষেত্ররূপে সেই বীজ গ্রহণ করিয়া পোষণ করিবে, বর্দ্ধন করিবে, এবং উপযুক্ত সময়ে আমারই ভবের হাটে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। সে তোমারই গুণ গাহিয়া মা মা বলিয়া ডাকিবে,

তোমারই চরণে কুসুম রাশি ঢালিয়া আনন্দে ভাসিবে; আমি দেখিইয়া সুখী হইব, আমার সৃষ্টিলীলা সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া বড়ই প্রীতি অনুভব করিব। হে সংসার লক্ষ্মি, উদাসীন ব্যোমভোলা মহেশ্বর, যখন আয় ব্যয়ের হিসাব ভুলিয়া, সংসারকে অসার ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে, তখনই হে মায়ারূপিণি! তুমি পাষাণ-নন্দিনী হইলেও, একবার দয়া করিয়া তোমার সেই সুন্দর মুখখানির অনন্ত-সুলভ কটাক্ষটুকু তাঁহার প্রতি বিক্ষেপ করিও। সেই যে তোমার কটাক্ষ-তরঙ্গ তাহার মর্ম্মস্থানে স্পর্শিবে, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, তাহাতেই—পাপের হিংস্র শ্বাপদ মরিয়া পুণ্যের রাজ-ধানী স্থাপিত হইবে। এই ত বিনী'র উপর ভগবানের খোলা হুকুম। এখন বিনী যেই হউক না কেন, যেখানেই বসুক না কেন, সে বৈষ্ণবী মায়ার পরওয়ানা লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ করিতেই আসিয়াছে। তাহার কটাক্ষে কত রাজ্য পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, কত ভস্মময় রাজ্য সৌন্দর্য্যলহরী তুলিয়া নাচিয়া উঠিবে, কত অমরাবতী শ্রীভ্রষ্ট হইবে, কত সাহারা অমরাবতী হইবে। এ ত বিধিবিহিত বিড়ম্বনা। বিনী'র ইহাতে কোন স্বাধীনতা নাই।

এই যে সহরের ঘোড়াগাড়ী—এ বিনী'র অনুগ্রহ। এই যে দরিদ্রের কাঁথা-নড়ী এ বিনী'র নিগ্রহ। যদি বিনী সংসার ছাড়িয়া যায়, তবে দেখিবে, মালী আর ফুল তুলিবে না, গাছের ফুল গাছেই শুকাইবে; আকাশে আর সুধাংশু হাসিবে না, চাঁদের সুধা চাঁদেই মিশাইবে; ধমনীতে আর উৎসাহ নাচিবে না, বুকের তরঙ্গ বুকেই মরিয়া আসিবে; জলে স্থলে শূন্য দেশে, হৃদয়ে, ঘাটে, মাঠে, শয়নে, ভোজনে যেখানে সেখানে কেবল বিনী'রই অনুগ্রহ নিগ্রহের বিনিময় দেখিতে পাই। তাই বলি বিনী'র বয়সের তুলনায়, তার কটাক্ষের ব্যাসটা অনেক বেশী। যদিও ভাই, তুমি আমি জ্ঞানকাণ্ডের বজরার মাথায় তর্কযুক্তির পাল তুলিয়া, অকূলপাথারে পরাৎপরের পান্‌সি ধরিতে ছুটিয়াছি, কিন্তু—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ॥

তাই বলি, আর গোলমালে প্রয়োজন নাই, এস আমরা বিনী'কেই বিনয় করিয়া বলি—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

পাঠক, এখন বিনী'কে চিনিয়াছ ?

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে দেখা যাউক, বাস্তবিকই কি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রগণের মধ্যে আত্মাভিমান ও আত্মগ্লানি, ঘৃণা ও হিংসা বড়ই প্রবল ছিল ? পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন না ? আমাদের মধ্যে এখন এত যে অনৈক্য তাহা কি জাতিভেদ হইতে প্রসূত ? কার্য্যকারণ দেখিয়া তাহা ত প্রতীত হয় না। একাসনে বসিয়া একপাত্রে আহার করিলে এবং এক গেলাসে জলপান করিলেই যে সহানুভূতি হইল, তাহা নহে। এ সকল করিয়াও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখন আমরা যে তলে তলে অন্যের ক্ষতি করিতে ব্যগ্র, কোন প্রতিবাসী, বা সহাধ্যায়ী, অথবা সহকর্ম্মচারীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমাদের হৃদয় যে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে, এ কথা কি উদারহৃদয় সাম্যবাদী অস্বীকার করিতে পারেন ? কিন্তু তখন ত এরূপ ছিল না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থদিগকে ত ঘৃণা করিতে পারিতেন না, বরং দয়া করিতেন, স্নেহ করিতেন,সকল কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। শূদ্রগণের আচার ব্যবহারে ব্রাহ্মণগণের ঘৃণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া তাঁহারা কখন শূদ্রদিগকে ঘৃণা করিতেন না। কায়স্থ ও শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সর্ব্বদা সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে কায়স্থ ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যে হিংসা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না ; আত্মগ্লানিতেও তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ থাকিত না। পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ও আহার ব্যবহার না থাকিলেও বিবাহাদি উপলক্ষে সকলেই আমন্ত্রিত হইতেন, এখনও হন ;

এবং বিপদে ও সম্পদে, সুখ ও দুঃখে কে কাহার সাহায্য না পাইতেন? পূজার্চ্চনা, ব্রতনিয়ম ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত হইবার নহে; এবং তন্তুবায়, রজক, সুবর্ণবণিক, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রভৃতিকে হিন্দুর নিত্য কার্য্যে ও নানা ক্রিয়া কলাপে সর্ব্বক্ষণ আবশ্যক। তখন এতদূর সহানুভূতি ও ঘনিষ্টতা ছিল যে, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নাম, পরিচয়, কার্য্যাদির বিষয় প্রত্যেকে অবগত ছিলেন। হিন্দু জাতিভেদ প্রথা এরূপ সুন্দররূপে গঠিত, বিভিন্ন শ্রেণী এ প্রকার বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত যে, প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অবলম্বন হইতে হইয়াছে। অমুক শ্রেণীর সহিত একবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব, ইহা কাহারও বলিবার যো নাই। তখন বিভিন্ন শ্রেণী স্ব স্ব ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা হেতু এক শ্রেণীর অন্যশ্রেণীর প্রতি প্রতিযোগিতা জনিত বিদ্বেষও জন্মিতে পারিত না। বিদ্বেষ ভাব দূরের কথা, এখন সাম্যনীতির প্রভাবে ন্যায়পরায়ণ ও দয়াবান্ হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র সকলেরই এক ব্যবসা—চাকুরী হইয়াছে। এখন এম এ শূদ্র, এম এ ব্রাহ্মণকে আপনার তুল্য জ্ঞান করেন; যদি উভয়ের কাহারও উচ্চপদ হয়, তবে হিংসায় অন্যের হৃদয় ফাটিয়া যায়। এখন সকলেরই এক প্রণালীর বিদ্যা, একরূপ শিক্ষা, একপ্রকার বৃত্তিই অবলম্বন, ইহাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসূতি; তাহার ফল অসন্তোষ ও বিদ্বেষ। তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেন; এখন সুশিক্ষিত, দাম্ভিকতাপূর্ণ হইয়া অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতকে ঘৃণা করেন। সমাজের এই পরম কল্যাণসাধনের জন্যই কি আমরা সাম্যনীতি শিক্ষা করিয়াছি? এই ঘোর বৈষম্যই কি ন্যায়পরায়ণতা ও দয়াশীলতার নিদর্শন! জাতিভেদ-সংহারকারীদের ইহাই কি হৃদ্যতা! একবার নিরপেক্ষভাবে বল দেখি, এই জাতিভেদ অভেদ করিতে গিয়া আমরা একসূত্রে বদ্ধ হইতেছি, কি তখন একসূত্রে বদ্ধ ছিলাম? স্থির জানিও, জীবনের এক উদ্দেশ্য সুতরাং এক শিক্ষা ও এককার্য্য বা ব্যবসায় অনৈক্যেরই মূল। সকলেই কেরাণী, ডেপুটি, মুন্সেফ বা ডাক্তার হইতে পারিলেই একতা জন্মিবে না। আমাদের রাজনৈতিক একতা যে ঘটিতেছে না, তাহার কারণ জাতিভেদ-প্রথা নহে; তাহার কারণ অনেকগুলি, এ প্রবন্ধে তদালোচনা হইতে পারে না।

মানব চরিত্রের অন্তর্দর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন, বিভিন্ন মানুষের

বিভিন্ন প্রকৃতি। কেহ বা সত্ত্বগুণপ্রকৃতিক, কেহ রজোগুণপ্রকৃতিক, কেহ রজঃ ও তমোগুণ মিশ্রিত, কেহ কেবল মাত্র তমোগুণ প্রকৃতিক। যাঁহারা প্রথম গুণ সম্পন্ন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দ্বিতীয় গুণ সম্পন্ন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা তৃতীয় গুণ সম্পন্ন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা চতুর্থ গুণ সম্পন্ন তাঁহারা শূদ্র। এই গুণ ভেদে—আন্তরিক শক্তিভেদে হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইংরাজ জাতির যেরূপ ঐশ্বর্য্য ভেদে জাতিভেদ, যে যত ধনী, সে তত উচ্চ শ্রেণীর; হিন্দুদিগের জাতিভেদের আদর্শ সেরূপ নীচ প্রকারের নহে। গুণানুযায়ী যেমন জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সমীচীন প্রথা স্থায়ী করিবার জন্য, যাহাতে গুণগুলির উত্তরোত্তর স্ফুরণ হয়, তাহার বিধান হইল। নিম্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহ ও আহার ব্যবহার দ্বারা সংমিশ্রণ করিয়া সেই স্ফুরণের ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে; নিম্নশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা প্রযুক্ত নহে। যাঁহারা জাতিভেদের বিরোধী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন; ইহাতে নিকৃষ্ট জাতি ত নিকৃষ্ট থাকিয়াই যাইবে, উৎকৃষ্টের সহবাসাভাবে তাহাদের আরও অবনতি হইবে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, শ্রেষ্ঠকে নিকৃষ্ট করিয়া শ্রেষ্ঠ হওয়া অপেক্ষা এবং তদ্দারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতার ক্রমশঃ বিকাশে বাধা দিয়া শ্রেষ্ঠ না হইয়া শ্রেষ্ঠের দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলে, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উভয়েই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন। হিন্দুসমাজে এতদিন তাহাই ঘটিতেছিল; ব্রাহ্মণই সকলের আদর্শ ছিলেন। সেই আদর্শ মত অন্য তিন শ্রেণী চলিতেছিলেন। তাহার ফল, স্বভাব চরিত্রে, আচার ব্যবহারে, ধর্ম্মাচরণে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা হিন্দু জাতির নিম্নশ্রেণী আজিও এত উন্নত, এত শ্রেষ্ঠ। যদি বিজাতি বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক ভারত অধিকৃত না হইত, তাহা হইলে এই জাতিভেদ-প্রথা কীদৃশ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইত, কে বলিতে পারে? তমোগুণ সম্পন্ন শূদ্রগণ অনুকরণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে উচ্চতরগুণ লাভ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া যে দেবচরিত্র প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিবেন, ইহাতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যেক শ্রেণী এক অবস্থাতেই থাকিত; অবস্থোন্নতি বা নিজ রুচিপ্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে

পারিত না। জিজ্ঞাসা করি, সমাজের প্রথমাবস্থায় কর্ম্মকার যে প্রকার লৌহের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিত, তন্তুবায় যেরূপ বস্ত্র বয়ন করিত, এবং অন্যান্য শিল্পিগণ যে প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত, সমাজের উন্নতির সহিত তাহার কি উৎকর্ষতা হয় নাই? এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সকলেই এতদিন যদি নিজ ব্যবসায়ে রত থাকিত, তাহা হইলে কি আরও নূতন নূতন যন্ত্র ও অভিনব শিল্প আবিষ্কৃত এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ের অনুপম শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত না? এখন কায়স্থ মুচির কাজ করিতে গিয়া, কর্ম্মকার সূত্রধরের কাজ শিখিতে গিয়া নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন না কি? তার পর রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্যান্তর গ্রহণের বিষয়। সত্য বটে, মৃত কৃষ্ণদাস পাল যদি স্বীয় ব্যবসায় লইয়া থাকিতেন তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটী দুর্লভ রাজনীতিজ্ঞে বঞ্চিত হইতেন; কিন্তু যখন জাতিভেদ প্রথার কঠোর শাসন ছিল, এই রুচিপ্রকৃতি অনুসারে তখনও এক আধটি কৃষ্ণদাস জন্মিতেন। শূদ্র একলব্যের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ইহার প্রমাণ। যখন জাতিভেদ-প্রথা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সেই ত্রেতাযুগে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রামচন্দ্রের সহিত গুহক চণ্ডালের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একলব্য বা গুহকচণ্ডালের জন্য জাতিভেদ উঠাইতে হয় নাই। সহস্র বা লক্ষ বৎসরে একটি একলব্য, গুহক চণ্ডাল বা কৃষ্ণদাস পালের জন্য অশেষ কল্যাণকর, মানবজাতির উত্তরোত্তর উন্নতির প্রধান সহকারী জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে হইবে না। এ প্রথা থাকিলেও সেইরূপ মহাপুরুষের উদয়ের ব্যাঘাত ঘটিবে না। যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি তাহার সেইরূপ শিক্ষা, সেই প্রকার জ্ঞানার্জ্জন বিধেয়। পুরাকালে তাহাই হইত; কেহই সম্পূর্ণ অজ্ঞান পশু ছিল না। হিন্দু রাজত্বের বিলোপের সহিত উপযুক্ত নেতার অভাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে বিধানকর্ত্তৃগণের দোষ কি? পক্ষান্তরে ইংরাজি শিক্ষার বলে জাতিভেদ শিথিল করিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার নহে? এণ্ট্রেন্স, এফ্ এ, বি এ, পাশ করিয়া সকলেই সমান হইয়াছে; এখন মুড়ি মিছরীর এক দর। মন্দটি যত সহজে ও শীঘ্র শিখিতে পারা যায়, ভালটি তদ্রূপ নহে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের যে পরিমাণে অবনতি হইয়াছে, শূদ্রের তাহার শতাংশও উন্নতি হয় নাই। এই যে বিবাহের পণ গ্রহণ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থের মধ্যে এই যে অর্থগৃধ্নতা ও পৈশা-

চিক আচার—ইহা কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণ কায়স্থের সেই সদাশয়তা পরার্থপরতা ও মহানুভাব ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে কেন? ইহা কি নিম্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণে নহে? এখনও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায় নাই, ইহাতেই এই ঘটিয়াছে; যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রে বিবাহ প্রচলিত হয় তাহাতে যে নৈতিক অবনতি ঘটিবে, সমাজময় যে উচ্ছৃঙ্খলতা আধিপত্য করিবে, তাহা কল্পনায় আনিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এখন বিচার্য্য, জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুজাতির যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, হিন্দুসমাজ নানা প্রকারে যে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোন জ্ঞানী, সমাজতত্বজ্ঞ, পরিণামদর্শী ব্যক্তি এ প্রথার উন্মূলনের পক্ষপাতী হইবেন না। যাঁহারা বাস্তবিক দেশহিতৈষী তাঁহাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এ প্রথা যতই শিথিল হইতেছে, আমাদের মধ্যে ততই অনৈক্য, ততই বিবাদ বিসম্বাদ বাড়িতেছে, আমাদের হৃদয় ততই বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতেছে, ঈর্ষ্যায় প্রাণ জর জর হইতেছে। আমাদের নৈতিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে; আমরা দিন্ দিন্ ঘোর অবনতির পথে ধাবিত হইতেছি। যে উদ্দেশ্যে আমরা এই পরম হিতকর প্রথা, হিন্দুসমাজের এই প্রধান গ্রন্থি শিথিল করিতে গিয়াছিলাম, তদ্বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। নানা বর্ণের মধ্যে যে সহানুভূতি ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র ছিল না, সমাজে একটী সুন্দর প্রীতিভাব বিরাজ করিতেছিল, তাহার স্থলে ঘোর বিরাগ জন্মিয়াছে, বাহ্য সাম্যের অভ্যন্তরে ভয়ানক বৈষম্যের বিষ সঞ্চিত হইতেছে। সকলে এক চাকরী—কেরাণীগিরি ডেপুটিগিরি, মুন্সেফী প্রভৃতি অবলম্বন করিতে গিয়া এখন অনেকের চাকুরী মিলা ভার হইয়া উঠিয়াছে; গবর্ণমেণ্টও আর চাকুরী যোগাইতে পারেন না। তাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের কলরবে জ্বালাতন হইয়া Technioal eduoation প্রচলনে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই Techuical education এরই নামান্তর কর্ম্মকার, সূত্রধর, কৃষক প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া। সম্প্রতি শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইতেছে। আমাদের একূল ওকূল দুকূল গেল!

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কটুকী।

বাঙ্গলা নাম—কট্‌কী ; হিন্দুস্থানী—কুট্‌কী ; ইংরাজী—Picrorrhiza Kurroa. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কট্বী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা। অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী। মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী ॥

ইহা একপ্রকার ঝোপের মত লোমযুক্ত গুল্ম। কাশ্মীর, শিকিম ও অন্য উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে উৎপন্ন হয় ; নিম্নবঙ্গে এ গাছ নাই। ইহার শিকড় একত্র বহুল পরিমাণে নামে। ঐ গুলি ধৌত ও খণ্ড খণ্ড হইবার পর বণিকের দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে ; তখন উহা দেখিতে কতকটা পাখীর পায়ের মত হয়।

> কট্বী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ।
> ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।
> প্রমেহ শ্বাস কাসাস্র দাহ কুষ্ঠ ক্রিমিপ্রণুৎ ॥

রস—তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীর্য্য—শীত ; গুণ—রুক্ষ, লঘু, দীপক, হৃদ্রোগে (কোষ্ঠবদ্ধ ও শোথযুক্ত হৃদ্রোগে) উপকারী, কফপিত্ত ও জ্বরনাশক। প্রমেহ (পিত্তজ) শান্তিকর, শ্বাস কাস দাহ ও ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠঘ্ন (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে উৎকট চর্ম্মরোগনাশক) ; প্রভাব—মলভেদক।

প্রয়োগ—কট্‌কী প্রধানতঃ পিত্তঘ্ন ও রেচক। ইহা প্রবল জোলাপের কাজ করে। ইহার মাত্রা, ক্বাথ করিতে হইলে ।০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত, ক্বচিৎ কখন ৸০ আনা পর্য্যন্তও দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহার ৸০ আনা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াও দাস্ত না হয়, তাঁহার জন্য আর ইহার মাত্রা না বাড়াইয়া, ইহা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য রেচক প্রয়োগ করা বা ইহার সহিত হরীতকী সোনামুখী প্রভৃতি রেচকান্তর সংযোগ করা উচিত। কিন্তু হরীতকী সোঁদাল প্রভৃতি নির্দ্দোষ মৃদু বস্তু ছাড়া অন্য বিরেচক (কট্‌কী সোনামুখী প্রভৃতি) প্রয়োগ করিতে হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মউরী প্রভৃতি কোনও বায়ুনাশক বস্তু থাকিবে ইহা যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। চরক

বলিয়াছেন—"রেচনং পিত্তহারিণাম্" অর্থাৎ পিত্তনাশ করিতে হইলে বিরেচনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আবার তিক্ত বস্তু স্বভাবতঃই পিত্তঘ্ন সুতরাং কট্‌কী উভয় কারণেই পিত্তনাশক। এই উভয় শক্তি থাকায় ইহা পিত্তঘ্ন গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ধনে ও মউরীর সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা পিত্তসংহারে বিশেষ শক্তিমান্ হয়।

জ্বররোগে পাচন দিতে হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা কট্‌কী ঘটিত পাচনই ভাল। বস্তুতঃ শাস্ত্রে জ্বররোগে (অতিসার অবর্ত্তমানে) যতগুলি পাচন আছে, প্রায় সকলগুলির মধ্যেই কটুকী দৃষ্ট হয়।

কয়েকটী মুষ্টিযোগ,—(১) কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, মিলিত ২ তোলা, জল '/।৷৹ 'সের, শেষ /৶৹ পোয়া, দু'তিনবারে সেব্য; ইহাতে অবিচ্ছেদ জীর্ণজ্বর শান্ত হয়। (২) কট্‌কী, পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুথা ও আকনাদি যথাবিধি কাথ করিয়া পান করিলে দোকালীন জীর্ণজ্বর প্রশান্ত হয়। (৩) কট্‌কী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা—এই পাচন পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে উপকারী। (৪) কট্‌কী, সজ্‌নের শিকড়ের ছাল, পিপুল মূল, অনন্তমূল, শুঁঠ, রক্তচন্দন, নিমছাল, হরীতকী প্রত্যেক ।৹ আনা, জল অর্দ্ধসের, শেষ /৹ ছটাক; ইহাতে শোধিত হিং চূর্ণ ৩ রতি মিশাইয়া সেবন করিলে প্লীহযকৃৎ ঘটিত পুরাতন জ্বর নিশ্চিত ভাল হয়। (৫) কট্‌কীচূর্ণ ও ভাল গিরিমাটী চূর্ণ প্রত্যেক ১ মাষা, মধুসহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত, কাস, অম্লপিত্ত, চর্ম্মরোগ, ক্ষত, শোথ, হাত পা জ্বালা, যকৃদ্বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগের পাচনেও কট্‌কীর প্রয়োগ হয়।

ডাক্তার মুদন সরিফ বলেন—কট্‌কী অধিক পরিমাণে রেচক কিন্তু অল্প পরিমাণে (এক আনা আধ আনা) জলের সহিত খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি ও অম্লপিত্তের দমন হয়।

সার্জ্জন মেজর টম্‌সন্ বলেন—ইহা জ্বরে ত উপকার করেই, আর ইহার তীব্র কাথ দিনে ৩।৪ বার খাওয়াইলে মলমূত্রাকারে প্রচুর পরিমাণে জল বাহির হইয়া শোথ আরোগ্য হয়।

শোথের কটুকাদ্যলৌহ, পুরাতন জ্বরের সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধে কট্‌কী আবশ্যক হয়।

কট্‌ফল।

বাঙ্গালা নাম—কট্‌ফল বা কায়ছাল; হিন্দী—কায়ফর; ইংরাজী Myrica Sapida. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ। শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥ সংস্কৃত নাম—কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা, ভদ্রবতী।

ইহা এক প্রকার বড় বড় গাছ; হিমালয়, মালয়, ব্রহ্মদেশ, খাসিয়া পাহাড় ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে ইহা জন্মে। এই গাছের ছোট ছোট ফল হয়, তাহাকেই কট্‌ফল বলে; কিন্তু ঐ ফলের পরিবর্ত্তে, ছালই ব্যবহৃত হয় সুতরাং কোন ঔষধে কটফল উল্লিখিত থাকিলে অধিকাংশস্থলে ছালই বুঝিতে হয়।

কট্‌ফল স্তবর স্তিক্তঃ কটু র্বাতকফ জ্বরান্।
হন্তি শ্বাস প্রমেহার্শঃ কাস কণ্ঠাময়ারুচীঃ॥

রস—তিক্ত কটু কষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—বাতশ্লেষ্ম, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস ও অরুচি নাশক। প্রভাব—কণ্ঠরোগ নাশক (কাথ পানে ও কবল করণে)।

প্রয়োগ—জ্বরে, জ্বরের সহিত কাসে বা কাসের আনুষঙ্গিক জ্বরে প্রধানতঃ ইহার প্রয়োগ। এতদ্‌ঘটিত মুষ্টিযোগ—(১) কায়ফল, পিপুল, গুলঞ্চ, কুড়, কণ্টকারী—এই পাচন কাসযুক্ত জ্বরে উপকারী। (২) কায়ফল, সৈন্ধব, গোলমরিচ, নিমছাল ও হরীতকীর ক্বাথ করিয়া গরম গরম মুখ মধ্যে ধারণ করিলে গলার মধ্যস্থিত ফোলা ঘা ও ব্যথা আরোগ্য হয়। (৩) কায়ফল, লোধ, মুথা, হরীতকী প্রত্যেক ॥• আনা, যথাবিধি কাথ কর্ত্তব্য—ইহা পুরাতন মেহ (কুন্থনে স্রাব নির্গম) রোগে বিশেষ উপকারী (মফস্বলের কোনও প্রাচীন কবিরাজ এই পাচন ব্যবহার করেন)।

কায়ফল চূর্ণ দ্বারা উত্তম নস্য প্রস্তুত হয়, অথবা ইহার সহিত অন্যান্য মশলা দিয়াও নস্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কায়ফল, তামাকপাতা চূর্ণ, একাঙ্গীচূর্ণ একত্র মিশাইলে সুন্দর নস্য হয়—ইহা নাকে টানিলে ক্রূর শ্লেষ্মা, মাথাধরা প্রভৃতি ভাল হয়। ডাঃ আরভিং বলেন—ওলাউঠা রোগী হিমাঙ্গ হইতে থাকিলে কট্‌ফলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ গায়ে মাখাইলে বিশেষ ফল দর্শায়।

শাস্ত্রোক্ত কটফলাদি পাচন যথা—কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনদ, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামুনহাটী, হিং, বেড়েলা, দশমূল, পিপুল-মূল যথাবিধি ক্বাথ করিয়া হিং ও আদার রস মিশাইয়া সেবনীয়। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, কর্ণমূলশোথ, স্বরভঙ্গ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস ও শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

কঠিনী।

বাঙ্গালা নাম—খড়ী, চা খড়ী বা খড়ীমাটী ; হিন্দী—খড়িয়া ও গৌরখড়ী ; ইংরাজী—Chalk. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে। সংস্কৃত নাম—খটিকা, খটী, কঠিনী, লেখনী। অন্য নাম—ধবলমৃত্তিকা, শ্বেত-ধাতু, বর্ণরেখা, পাণ্ডুমৃৎ।

খড়ী অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন—ইহা শুষ্ক মৃত্তিকাখণ্ডের মত, দেখিতে শাদা। হিন্দুর ছেলেকে জীবনের প্রত্যূষ কালেই খড়ী কি বস্তু তাহা জানিতে হয় ; যেহেতু প্রথম অক্ষর পরিচয় কালে নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে কাষ্ঠফলকের উপরে লিখিত ক খ প্রভৃতি অক্ষরের উপরে খড়ী দ্বারা শিশুকে হাত বুলাইতে হয়। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সহর-স্থান সমুদয় হইতে ক্রমে এ প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। কোন কোন পাহাড়ে খড়ী থাকে ; যেখানে থাকে, সেখানে উহা প্রকাণ্ড শ্বেতশৈলবৎ দৃষ্ট হয়। উহা দুই প্রকারের আছে—এক প্রকার কোমল ও অতি শুভ্র, আর এক প্রকার কঠিন ও অপেক্ষাকৃত কম শুভ্র। কোমল গুলিকে ফুলখড়ী বলে ; এই গুলি দ্বারা স্কুল-কলেজে ও রেলওয়ে ষ্টেসনে বোর্ডের (কাষ্ঠফলকের) উপরে লেখা হইয়া থাকে। কঠিন গুলি চিত্রকরেরা রঙের জন্য ব্যবহার করে। উভয় খড়ীরই ঔষধীয় শক্তি আছে—ক্রমে বলা যাইতেছে।

খটিকা দাহজিচ্ছীতা মধুরা বিষ শোথজিৎ।
তদ্বৎ পাষাণখটিকা ব্রণপিত্তাস্রজিদ্ধিমা।
লেপাদেতদ্‌গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা॥

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—দাহনাশক, (বাহ্য প্রলেপে জ্বালা নিবারক, ভক্ষণে হৃৎকণ্ঠদাহ নাশক), শোথঘ্ন (প্রলেপে); প্রভাব—বিষনাশক (মক্ষিকাদি দংশনের)। পাষাণখড়ীরও এই সমস্ত গুণ আছে; অধিকন্তু ইহা রক্তপিত্তনাশক, (যেহেতু ইহাতে একটু লৌহের অংশ আছে, তজ্জন্যই কম শুভ্র), প্রলেপে ইহার গুণ ফুলখড়ীর ন্যায়। কিন্তু ভক্ষণে মৃত্তিকার তুল্য-গুণ। মৃত্তিকার গুণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগ—অম্ল, অম্লশূল ও উদরাময়েই খড়ীর প্রধানতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ধারক; ইহার ধারকগুণ কবিরাজ ডাক্তার উভয় সম্প্রদায়ের নিকটেই সুপরিচিত; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোকে ইহার এই শক্তির কথা সুস্পষ্ট লিখিত নাই—না থাকিলেও একটু চিন্তা দ্বারাই উহা এইরূপে বুঝিয়া লওয়া যায়, যথা—"দাহজিৎ" অর্থাৎ দাহনাশক হইলেই পিত্তনাশক হইতে হইবে। পিত্তের গুণ স্রবণ বা নিঃসরণ। কোনও বস্তু এই শক্তির বিরোধী হইলেই উহা অবশ্য ধারক বা সংকোচক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা "শোথজিৎ"। শোষক বস্তুই শোথনাশক হয়, আবার শোষক বস্তুমাত্রই ধারক হইয়া থাকে। যেমন ফট্‌কিরি শোথহর ও ধারক, আফিং শোথহর ও ধারক ইত্যাদি।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে "ধারক" বিশেষণ না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ-কারগণ ইহার এই শক্তি জানিতেন ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। শাস্ত্রোক্ত "কঠিন্যাদি পেয়া"র উপকরণ এই—ফুলখড়ী ৮ তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য ঈষৎ কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে কোনও মৃৎপাত্রে ১ সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া তাহার উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ পান করিতে হয়। ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমাশয় রোগে উপকারী।

ফুলখড়ী চূর্ণ ও মউরী চূর্ণ সমভাগে ৵০ বা ৶০ আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে অজীর্ণ বা অম্লজনিত শূলরোগ নিবারিত হয়। ফুলখড়ী, চূণের জল, কড়ী ভস্ম, শামুক ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ইহারা পরস্পর প্রায় সমগুণ। কবিরাজগণ অপেক্ষা ডাক্তার মহাশয়েরাই খড়ী ঘটিত ঔষধ অধিক ব্যবহার

করিয়া থাকেন। যেহেতু, কবিরাজেরা খড়ী অপেক্ষা কড়ী ভস্ম বা শঙ্খ ভস্মকেই অধিক গুণশালী দেখিতে পান্। খটিকামিশ্র (Chalk Oompoud) ডাক্তারদের উদরাময়ের একটা প্রধান ঔষধ। উহার উপকরণ ফুলখড়ী ১১, লবঙ্গ ১॥০, জায়ফল ৩, স্যাফ্রাণ ৩, দারুচিনি ৪, ছোট এলাচ ১ ও চিনি ২৫ ভাগ।

খড়ী বা খড়ী ঘটিত ঔষধ একাদিক্রমে বহুদিন সেবন করা উচিত নয়, যেহেতু তদ্দারা অন্ত্রে উহার কিয়দংশ সঞ্চিত হইতে পারে। যাঁহাদের শূলের জন্য খড়ী ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহারা যেন মধ্যে মধ্যে একটি বিরেচন ঔষধ সেবন করেন, তাহা হইলে ঐ দোষের প্রতীকার হইবেক।

কণ্টকারী।

বাঙ্গালা নাম—কণ্টকারী; হিন্দী—কংটেলি, রিংগিণী বা ভটকটৈয়া; ইংরাজী—Solanum Tanthocarpum; সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা। কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥ (শ্বেত কণ্টকারীর) শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষণা ক্ষেত্রদূতিকা। গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী॥ সংস্কৃত নাম—কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী। ইহার অন্য নাম—প্রচোদনী, রাষ্ট্রীকা, অনাক্রান্তা, ভণ্টাকী, সিংহী, বহুকণ্টা, চিত্রফলা।

ইহা এক প্রকার কণ্টকময় গুল্ম, ভূমির উপরে বিস্তৃত হইয়া জন্মে। ইহার ফুল অনেকটা বেগুনের ফুলের মত; ক্ষুদ্র গোলাকার ফল হয়, তাহার গায়ে শাদা চক্র চক্র চিহ্ন থাকে। পতিত জমিতে, বালুকাময় ময়দানে ও নদীর তীরে সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয়। ইহা দুই প্রকার আছে; এক প্রকার বেগুনে ফুল ও এক প্রকার শাদা ফুল হয়; দ্বিতীয় প্রকারকে শ্বেত কণ্টকারী বলে। শ্বেত কণ্টকারী বড় দুর্ল্লভ, ইহার সংস্কৃত নাম—শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী।

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্॥

তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ।
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু।
হন্যাৎ কফমরুৎ কণ্ডূ কাস শ্বাস ক্রিমি জ্বরান্॥
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥

রস—কটুতিক্ত; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—রুক্ষ; দীপক ও পাচক, লঘু, কাস শ্বাস জ্বর বাতশ্লেষ্মা পীনস পার্শ্ববেদনা ক্রিমি ও হৃদ্রোগ (কাস জনিত) প্রশমিত কারক। প্রভাব—সারক। উভয়েরই ফল—কটুরস ও কটুবিপাক, শুক্ররেচক (ইহার ফল সেবনে পুরুষের শুক্র শীঘ্র স্খলিত হয় ও স্ত্রীলোকের রজঃ নিঃসারিত হয়), মলভেদক, তিক্ত, পিত্ত ও অগ্নিকর এবং লঘু। ইহা বাতশ্লেষ্মা কণ্ডূ কাস শ্বাস ক্রিমি ও জ্বর নাশ করে। সাধারণ কণ্টকারীর সমস্ত গুণ শ্বেত কণ্টকারীতে আছে, অধিকন্তু ইহা গর্ভপ্রদ ও বন্ধ্যাদোষনাশক।

প্রয়োগ—কণ্টকারীর প্রধান ব্যবহার শ্বাস কাস ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে। ইহা কফনিঃসারক; সুতরাং যে স্থানে রোগীর অধিক শ্লেষ্মা উঠে, সে স্থলে ইহা না দিয়া,শুষ্ককাস ও শ্বাসের শ্লেষ্মস্রাবহীন আক্ষেপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কণ্টকারীর রস "তিক্ত কটু" লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার তিক্ততা অতি অল্প, মুখে দিলে অতি সামান্য অনুভূত হয়; তথাপি শাস্ত্রে ইহা পঞ্চতিক্তগণের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। পঞ্চতিক্ত কষায় যথা—ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহনাগরেণ সপৌষ্করঞ্চৈব কিরাততিক্তং। পিবেৎ কষায়স্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্॥ অর্থাৎ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ (অধিকন্তু শুঁঠও এ স্থলে তিক্তগণ মধ্যে) পুষ্কর মূল এবং চিরতা এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চতিক্ত বলে। এই পঞ্চতিক্তের কাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়।

শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগাধিকারে যে "পঞ্চতিক্ত ঘৃত" আছে, তন্মধ্যেও কণ্টকারী গৃহীত হইয়াছে; যথা—নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচীং বাসকং তথা......... ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলাগর্ভ সংযুতম্। পঞ্চতিক্ত মিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্" অর্থাৎ নিম, পল্তা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক যথাপরিমাণে, ত্রিফলাযোগে ৪ সের ঘৃত সহ পাক করিবে। এই ঘৃতের নাম পঞ্চতিক্ত ঘৃত। ইহা কুষ্ঠনাশক।

ইহার একটী বিশেষণ আছে "সরা" অর্থাৎ মল নিঃসারক। তাই বলিয়া ইহা হরীতকী বা সোঁদাল আঠার মত প্রবল রেচক নহে, বায়ুকে অধঃ করিয়া, বদ্ধ মলের নিঃসারিত হইবার প্রবণতা দেয় মাত্র। অন্যান্য সারক উপকরণের সহিত মিলিত না হইলে ইহার উক্ত শক্তি সমধিক প্রকাশিত হয় না। "সরা" শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ ইহার মূত্র নিঃসারণ শক্তিই বুঝিতে হইবে।

ইহা "অগ্নিদীপক ও পাচক"; তাই বলিয়া যমানী মউরী প্রভৃতির মত পাচক ঔষধের উপকরণ মধ্যে গৃহীত হয় না। মর্ম্ম এই যে, জ্বর কাস আমবাত প্রভৃতি রোগে, আম দোষ নিবারণ করিয়া অগ্নির তীক্ষ্ণতা পুনরানয়ন করিতে ইহার শক্তি আছে।

ইহা জ্বররোগের পাচনে (বিশেষতঃ উহা বাতশ্লেষ্ম ঘটিত হইলে) প্রায় সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। কাস রোগে ইহার প্রয়োগ অপরিহার্য্যই বটে। কাসযুক্ত জ্বরের উৎকৃষ্ট পাচন—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, কুড়, পিপুল, কটুকী, বামনহাটী, শুঁঠ, যষ্টিমধু যথাবিধি ক্কাথ করিয়া সেব্য।

শ্বাসকাসঘ্ন পাচন—কণ্টকারী, হুরালভা, তুলসীমঞ্জরী, বড় এলাচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শ্বেত আকন্দের ছাল, যথাবিধি ক্কাথ করিয়া সেবন করিলে উৎকাসি, শুষ্ককাস ও শ্বাস আরোগ্য হয়। দাস্ত না হইলে ইহাতে বহেড়া যোগ দিবে।

ক্ষুদ্রাদিকষায়—ক্ষুদ্রামৃতা নাগর পুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফ মারুতোদ্ভবে। সশ্বাস কাসারুচি পার্শ্বরুক্করে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবে চ শস্যতে॥ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) এই সকলের ক্কাথকে ক্ষুদ্রাদি কষায় বলে; ইহাতে বাতশ্লেষ্ম জ্বর এবং শ্বাস কাস অরুচি ও পার্শ্ববেদনা যুক্ত সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

ব্যাঘ্র্যাদি কষায়—ব্যাঘ্রীচৈব সিংহীচৈব লোধ্রং কুষ্ঠপটোলকম্। জ্বরে কফাত্মকেচৈতৎ পাচনং স্যাৎ তদুত্তমম্॥ কণ্টকারী, বৃহতী, লোধ, কুড়, পটোলপত্র এই সকলের যথাবিধি কৃত ক্কাথ শ্লেষ্মজ্বরে উপকারী। প্রসিদ্ধ স্বল্প পঞ্চমূলের মধ্যে কণ্টকারীও একটী উপকরণ; স্বল্প পঞ্চমূল যথা—শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্। অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহা বাতপিত্ত জনিত সমস্ত রোগের প্রতিকারক।

কণ্টকারী বাতরোগে (Rheumatism) বড় উপকারী। এতদ্ঘটিত বাত-রোগের পাচন যথা—কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ /০/০ পোয়া; দুইবারে সেব্য—ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। দাস্ত না হইলে শুঙ্গীহরীতকী চূর্ণ মিশাইবে।

কণ্টকারী, কেঁউ ও সজিনার মূল এবং উই মৃত্তিকা একত্রে গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের ফোলা ও ব্যথা নিবারিত হয়।

শোথ রোগের সিংহাস্যাদি পাচন যথা—সিংহাস্যামৃত ভণ্টাকী ক্বাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্। পীত্বা শোথং জয়েদ্ জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্॥ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, ইহাদের যথাবিধি ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে শোথ রোগ এবং তৎসহ শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য হয়।

শুষ্কীকৃত কণ্টকারীর ফলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া ঐ লবণ বাহির করিয়া লইবে—এই লবণ ৵০ আনা মাত্রায়, শীতল জলে গুলিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কফ তরল হইয়া উঠে এবং পেট গরম হইয়া উৎকাশি হইলে বা কাসিতে কাসিতে বমি হইলে তাহা নিবারিত হয়।

ডাঃ উইল্‌সন বলেন—কণ্টকারী, তিক্ত বলকারক (bitter tonic) ও উদরের বায়ু নাশক। পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুস্‌কুড়ী হইলে ইহার প্রলেপ উপকারী এবং দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টকারী সিদ্ধ জলের উত্তপ্ত বাষ্প লাগাইলে উহার উপশম হয়।

ডাঃ মোরহেড বলেন—ইহার আর যে যে গুণই বলা হউক, ইহার কফ-নিঃসারক শক্তিই প্রধান।

শোথ রোগের "পুনর্ণবাদি চূর্ণ," কাসের "কণ্টকারী ঘৃত" ও "ব্যাঘ্রী-হরীতকী"তে, শ্বাসের "শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণে" "শৃঙ্গীগুড় ঘৃতে" ও "ভার্গীশর্করা"য় এবং "বিষ্ণু তৈলে" "মহা নারায়ণাদি তৈলে" ও প্লীহার "অভয়া লবণে" কণ্টকারী আবশ্যক হয়।

কদম্ব।

বাঙ্গালা নাম—কদম ; হিন্দী—কদম ; ইংরাজী—Nauclea Parviflora. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ। সংস্কৃত নাম—

কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হরিপ্রিয়। অপর নাম—ললনাপ্রিয়, হারিদ্র, অশোকারি, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, জাল, কাদম্বর্য্যা, সীধুপুষ্প, জীর্ণপর্ণ, মহাঢ্য, কর্ণপূরক।

কদম্বের গাছ খুব বড় বড় হয়, ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের মধ্য ও অগ্র হইতে ডাল পালা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং ঐ ডালে বড় বড় পাতা থাকায় নীচে বেশ ছায়া পড়ে। ইহার ফুল ভাঁটার মত গোলাকার ও সর্ব্বাঙ্গে গোড়া-হলুদ আগা-শাদা সরল এক ইঞ্চি প্রমাণ সূত্রবৎ বেষ্টিত থাকে। ফল পাকিলে ঐ গুলি ঝরিয়া যায়। ফুলগুলি দেখিতে অতীব মনোরম ও সুখস্পর্শ; তাহাতে অত্যন্ত মৃদুসৌরভ আছে। বর্ষাকালে এই ফুল বৃক্ষের মস্তক আকীর্ণ করিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। কথিত আছে, এই বৃক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও ইহার তলদেশ তাঁহার কেলি-নিকেতন ছিল।

কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ।
সরো বিষ্টম্ভকৃদ্ রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥

রস—মধুর অম্ল কষায়; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক, কফকর; প্রভাব—স্তন্যবর্দ্ধক (ইহার ফলের রস সেবনে স্ত্রীলোকের স্তনের দুধ বাড়ে) ও বায়ুবর্দ্ধক।

মতান্তরে কদম্বের গুণ।

কদম্বঃ কটুকস্তিক্তো মধুরস্তুবরঃ পটুঃ।
শুক্রবৃদ্ধিকরঃ শীতো গুরু বিষ্টম্ভকারকঃ॥
রুক্ষঃ স্তন্যপ্রদো গ্রাহী বর্ণকৃদ্ যোনিদোষহা।
রক্তরুগ্ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ বাতপিত্তং কফং ব্রণম্।
দাহং বিষং নাশয়তি শুক্ষুরা শ্চাস্তবরাঃ।
শীতবীর্য্যা দীপকাশ্চ লঘবোঽরোচকাপহাঃ॥
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নাঃ ফলং রুচ্যং গুরু স্মৃতম্।
উষ্ণবীর্য্যং কফকরং তৎ পক্বং কফপিত্তজিৎ॥
বাতনাশকরং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

কদম্ব—মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু ও লবণরস। ইহা শুক্রবৃদ্ধিকারক

(ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবনে শুক্র গাঢ় হয়), শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকর, রুক্ষ, স্তন্যবর্দ্ধক, ধারক, বর্ণকর (কদম ফুলের পাপড়ী দুধের সর সহ বাটিয়া মুখে মাখিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়), যোনিদোষহারক (ছালের ক্বাথে যোনি ধৌত করিলে তত্রত্য রোগ আরোগ্য হয়), রক্তরোগ (রক্তপিত্ত), মূত্রকৃচ্ছ্র (কচি পাতার রস মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকারী), বাতপিত্ত, কফ, ব্রণ (প্রলেপে), দাহ ও বিষ প্রশমিত করে। ইহার অঙ্কুর—কষায়রস-প্রধান এবং শীতবীর্য্য, লঘু, অরুচি নাশক, রক্তপিত্ত ও অতিসার নিবারক। ফল—রুচিকর, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, কফকর। পাকা ফল—কফপিত্তঘ্ন এবং বাতনাশক বলিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

প্রয়োগ—ঔষধার্থে কদমের ছালের ও পাতার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ফলের রস অনেকাংশে কাঁচা আমলকীর রসের তুল্যগুণ; কিন্তু তদপেক্ষা ঈষৎ গুরুপাক। এই ফলের উত্তম অম্ল রাঁধিয়া খাওয়া যায়—বঙ্গের অনেক অঞ্চলে ইহার এইরূপ ব্যবহার আছে। কচিপাতার রস পরিষ্কার চিনি সহ সেবন করিলে বিষাক্ত মেহের প্রাবল্যাবস্থায় বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। ছালের ক্বাথ মেহ ও শ্বেতপ্রদরে উপকার দর্শায়। জ্বরে বা অন্য উত্তাপ জনক কারণে মাথা ধরিলে, কপালে কদম পাতা বাঁধিয়া রাখিলে উপশম পাওয়া যায়। কদমের শিকড়ের ছাল ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ সেবন করিলে, ক্রিমি নষ্ট হয়, শিশুকে অর্দ্ধতোলার ক্বাথ দিবে। কচিপাতার রসে সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া খাইলেও ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ কানাইলাল রায় বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ইহার ছাল জ্বরঘ্নরূপে ব্যবহার করিয়াও বেশ ফল পাওয়া যায় ও মুখের ঘায়ে ইহার কুলী উপকারী। মেহ রোগে গোমেশ্বর রস প্রভৃতি ঔষধে কদম্ব মূলের ছাল আবশ্যক হয়।

কদম্বের ফল হইতে আয়ুর্ব্বেদমতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তজ্জন্যই মদ্যের একটী নাম কাদম্বরী।

কদলী।

বাঙ্গালা নাম—কলা ; হিন্দী—কেলা বা কেরা ; ডাক্তারী নাম—Plantain, Musa sopientum. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কদলী সুফলা রম্ভা মোচা

বারণবল্লভা। সুকুমারা চর্ম্মণ্বতী ত্বকপত্রী নগরৌষধি ॥ সংস্কৃত নাম—কদলী, সুফলা, রম্ভা, মোচা, বারণবল্লভা, সুকুমারা, চর্ম্মণ্বতী, ত্বক্‌পত্রী, নগরৌষধি। ইহার অন্যনাম—অংশুমৎফলা, কাষ্ঠীলা, কদল, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, মোচক, রোচক, আয়তচ্ছদা, তন্তুবিগ্রহা, অম্বুসারা।

কলার গাছ অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, যেহেতু ইহা বাড়ীর উঠান-ধারে জন্মে, বাগানেও জন্মে—অন্ততঃ পূজাপার্ব্বণেও মাঙ্গলিক উপাদান স্বরূপ গৃহস্থের বাড়িতে আনীত হইয়া থাকে। ইহা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, আমেরিকা প্রভৃতি মধ্যম-তাপযুক্ত স্থান সমূহে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই গাছ হস্তীর অতি প্রিয় খাদ্য, তাই ইহার সংস্কৃত নাম "বারণবল্লভা"; চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত পাতা বলিয়া ইহার নাম "ত্বকপত্রী"; সূর্য্যের আলোক ভিন্ন আদৌ জন্মিতে পারে না বলিয়া নাম "অংশুমৎফলা"; ফল দেখিতে অনেকটা হস্তীর দন্তের মত বলিয়া ইহাকে "হস্তিবিষাণী" বলা হয়; একবার মাত্র ফল হইয়াই গাছ মরিয়া যায় বলিয়া নাম "সকৃৎফলা"; গাছের সার নাই তজ্জন্য নাম "নিঃসারা"; রাজগণের অতি প্রিয় বলিয়া নাম "রাজেষ্টা"; বালকেরাও ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া "বালকপ্রিয়া"; মানুষের পা স্থির ও সোজা হইয়া থাকিলে যেমন দেখিতে হয় তেমনি বলিয়া নাম "উরুস্তম্ভা"; বনে অন্যান্য বৃক্ষসমূহের মধ্যে কদলী শ্রেণী থাকিলে বড়ই শোভা হয় বলিয়া নাম "বনলক্ষ্মী"; পত্র বড় বড় বলিয়া "আয়তচ্ছদা"; ইহার অঙ্গ মধ্যে তন্তু সমূহ থাকে এজন্য "তন্তুবিগ্রহা" বলিয়া অভিহিত হয় এবং গাছের ভিতরে কেবল জলই সর্ব্বস্ব বলিয়া নাম "অম্বুসারা"। ভারতবর্ষই কলার প্রধান জন্মস্থান, তবে পার্ব্বত্যস্থানে ভাল জন্মে না। হিমালয় পাহাড়ের শৈলপুঞ্জোপরি এক প্রকার ছোট ছোট কলা হয়, তাহাতে বীজই অধিক, শাঁস খুব কম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাই পক্ষীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাকে দিগ্ দিগন্ত হইতে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহ খাইয়া জীবন রক্ষা করে। পূর্ব্ববঙ্গে ও মালাবার উপকূলে ইহার অধিক আবাদ হয়। চট্টগ্রামের বনপ্রদেশে এত কলাগাছ আছে যে, দেখিলে চমৎকার লাগে, তথাচ হাতী ও গয়াল নামক মহিষজাতীয় প্রাণী উহাই খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। চট্টগ্রামের গ্রামসমূহেও কলাগাছ ঘাস

দূর্ব্বার মত অপর্য্যাপ্ত। মাঠ পড়িয়া থাকিলে এত কলাগাছ জন্মে যে, আবাদ-কালে তাহা মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। সিঙ্গাপুর, মালয় ও ভারত-বর্ষের দ্বীপপুঞ্জে ইহা বহুলপরিমাণে জন্মে। সেখানে প্রায় ৮০ প্রকারের কলা আছে। চীন দেশে একপ্রকার কলাগাছ আছে, তাহার আদৌ ফল হয় না। আর এক প্রকার আছে দেখিতে ডুমুরের মত। স্পেনদেশের দাক্ষিণাংশে কলা হয়, অন্যাংশে তাপগৃহ (hot bed) ব্যতীত জন্মে না। আফ্রিকাতেও কলা হয়। কিন্তু বিলাতে ভাল কলা জন্মে না। রেঙ্গুনে প্রত্যেক বাটিতেই কলাগাছ আছে।

মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফনুদ্ গুরু।
স্নিগ্ধং পিত্তাস্র তৃড়্ দাহ ক্ষত ক্ষয় সমীরজিৎ ॥
পক্বং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃংষ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ক্ষুৎতৃষ্ণা নেত্রগদহৃন্ মেহঘ্নং রুচি মাংসকৃৎ। ভাঃ প্রকাশ।

(সিদ্ধ কাঁচা কলার) রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—সংকোচক ও ঈষৎ উদরভার জনক; কফনাশক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তঘ্ন, দাহতৃষ্ণানাশক, ক্ষতক্ষয় (ফুস্‌ফুসে ক্ষত জনিত যক্ষ্মা) নাশক ও বায়ু প্রশমক।

(পাকা কলার) রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীত; গুণ—শীতল, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধক, দেহের স্থূলতাকারক, ক্ষুৎতৃষ্ণানাশক (ক্ষুধাতৃষ্ণাকালে ভাল পাকা কলা পাইলে আর কিছু আবশ্যক হয় না), নেত্র-রোগহর (বায়ুজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা দূর করে), মেহনাশক (জ্বালাযুক্ত মেহ ও বহুমূত্র নিবারক), রুচিকর ও মাংসবৃদ্ধিকর।

রাজ বল্লভ মতে।

কদলং মধুরং বৃষ্যং কষায়ং নাতিশীতলম্।
রক্তপিত্তহরং হৃদ্যং রুচ্যং শ্লেষ্মকরং গুরু ॥

কলা—মধুর, কষায়, বৃষ্য, নাতিশীতল, রক্তপিত্তহর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক ও গুরুপাক।

মতান্তরে কদলীর গুণ।

কদলী শীতলা গুর্ব্বী বৃষ্যা স্নিগ্ধা মধুঃ স্মৃতা।
পিত্তরক্তবিকারঞ্চ যোনিদোষং তথাশ্মরীং ॥
দীপ্তাগ্নেঃ বীর্য্যকৃৎ সদ্যঃ ন মন্দাগ্নেঃ হিতা হি সা ॥

কদলী—শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর, পিত্তরক্ত ঘটিত বিকার সমূহের প্রশমক, যোনিদোষহর (শ্বেতপ্রদরাদি) ও অশ্মরী (পাথুরী) নাশক। ইহা দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির সদ্য বীর্য্যকারক, কিন্তু অগ্নিতেজোহীন ব্যক্তির উপকারী হয় না।

কোমলকদলীর গুণ।

কোমলং কদলং শীতং মধুরং চ কষায়কং।
রুচ্যং অম্লং সমুদ্দিষ্টং বাতপিত্তহরঞ্চ তৎ॥

কলা অত্যন্ত পক্কাবস্থায় কোমল হইলে মধুর, অম্ল, অত্যল্প কষায় এবং অধিক রুচিকর ও বাতপিত্ত নাশক হয়।

মধ্যমকদলীর গুণ।

তৃড়্ রক্তপিত্তাদিগদ প্রমেহান্ ফলং কদল্যা স্তরুণং নিহন্তি।
সংগ্রাহিকং তিক্তকষায় রুক্ষং রক্তাতিসারং শমযেৎ চ ভারং॥

মধ্যম-পক (ডাঁসা) কলা—রক্তপিত্ত ও মেহ (স্রাবশীল মেহ) নাশ করে, ইহা সংকোচক, তিক্ত কষায় ও রুক্ষ, অধিক ভার ও রক্তাতিসার প্রশমক (ঘোলের সঙ্গে চট্‌কাইয়া দিলে)।

কদলীপুষ্পের গুণ।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয় প্রণুৎ॥

কলার ফুল—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, ঈষৎ গুরুপাক, বাতপিত্তহর, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নাশক।

মোচার গুণ।

কদলী-মোচকং হৃদ্যং কফঘ্নং ক্রিমিনাশনং।
তৃষ্ণা প্লীহ জ্বরং হন্তি দীপনং বস্তিশোধনম্॥ রাজবল্লভ।

কলার মোচা—হৃদ্য, কফঘ্ন, ক্রিমিনাশক, তৃষ্ণানিবারক, প্লীহা ও জ্বররোগীর উপকারী, দীপন ও বস্তি শোধক (মূত্রকৃচ্ছ্র, কষ্টরজঃ প্রভৃতি নাশক)।

কদলীকন্দের গুণ।

বল্যঃ কদল্যাঃ কন্দঃ স্যাৎ কফপিত্তহরো গুরুঃ।
বাতলো রক্তশমনঃ কষায়ো রুক্ষশীতলঃ।
কর্ণশূলং রজোদোষং সোমরোগং নিযচ্ছতি॥

কলার কন্দ অর্থাৎ যে ডাঁটার চারিদিকে কলা বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহা (কচি অবস্থায়) বলকর, কফপিত্তনাশক, গুরুপাক, ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক, রক্ত রোধক, কষায়, রুক্ষ, শীতল, কর্ণশূল, রজোদোষ বিশেষতঃ বহুমূত্র প্রশমিত করে।

কদলীর ভেদ।

মাণিক্য মর্ত্ত্যা * মৃত চম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণা স্তেধিকা ভবন্তি নির্দ্দোষতা স্যাৎ লঘুতা চ তেষাম্॥

মাণিক্য, মর্ত্ত্যমান, অমৃত প্রভৃতি কদলীর বহুপ্রকার ভেদ আছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে উক্তগুণ সমুদায় বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান এবং তাহারা নির্দ্দোষ ও লঘুপাক। দেশ বিদেশে সব্বশুদ্ধ কতপ্রকার কলা আছে তাহার বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করা কঠিন ; তবে মোটা মুটি যতগুলি প্রধানতঃ জানা যায়, তাহার নাম ও বর্ণনা দেওয়া হইল :—

মাণিক্য—এক প্রকার অতি উজ্জ্বলবর্ণ সুমিষ্ট কলা, বোম্বায়ে জন্মে।

মর্ত্ত্যমান—সুশ্রী, পীতাভ, সুগোল, গায়ে ফোটা ফোটা হয়, অতীব সুস্বাদু, বাঙ্গালীরা এই কলাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, দুগ্ধসহ বড়ই উপাদেয় হয়। ইহাকে চাটিমকলাও বলে।

অমৃত—অতীব মিষ্ট, বোম্বায়ে উৎপন্ন হয়।

চম্পক (চাঁপা)—ঘোর পীতবর্ণ, খুব পাকিলে ঈষৎ অম্ল, দেখিতে ছোট, বেশ সুগন্ধি।

---

* এই শ্লোকে "মাণিক্য মর্ত্ত্যামৃত" স্থানে কেহ কেহ "মাণিক্যমুক্তামৃত" পাঠ করিয়া বলেন—মর্ত্ত্যা অর্থাৎ মর্ত্ত্যমান কলা আমাদের দেশের নয়, উহা মার্টাবান হইতে আসিয়াছিল। এ কথা আমাদের সঙ্গত বোধ হয় না, যেহেতু মুক্তা নামে কোনও কলা দৃষ্ট হয় না, মর্ত্ত্যমান শব্দও বহুকাল হইতে শাস্ত্রে রহিয়াছে।

ঢাকাই মর্ত্ত্যমান—দেখিতে প্রায় সবুজ, তত সুশ্রী নয়, কিন্তু খাইতে ভাল।

কালিবৌ বা কাবুলী কলা—ফল অত্যন্ত খাট ও মোটা, গাছও খুব মোটা অথচ খর্ব্বাকৃতি, কাঁদি নামিলে মাটী খুড়িয়া দিতে হয়। এই কলা গরম দুধে ফেলিলে গলিয়া যায়, খাইতে মিষ্ট।

কাঁঠালী—পাকিলে ঈষৎ পীত হয়, মর্ত্ত্যমান অপেক্ষা কম স্বাদু, চট্‌কাইলে আঠা আঠা হয়। ইহা পূজাপার্ব্বণে অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাকে পূর্ব্ববঙ্গে কদমা বলে।

লতা কাঁঠালী—ইহাও এক প্রকার কাঁঠালী; পূর্ব্বোক্ত কাঁঠালী অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

মালভোগ—সুমিষ্ট ও সু-তার, মর্ত্ত্যমানেরই প্রকার-ভেদ।

চিনি চাঁপা—এক প্রকার চাঁপা কলা, পূর্ব্বোক্ত চাঁপা অপেক্ষা অধিক মধুর ও সু-তার।

ঠোঁটে কলা—ছোট ছোট কলা, ঘোর সবুজ বর্ণ, পাকিলে অধিক সুমিষ্ট হয় না, কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত কষায়, তজ্জন্য উদরাময় রোগীর সুপথ্য।

কাঁচ কলা—ইহা কেবল কাঁচা অবস্থায় ভুক্ত হয়, অতি উৎকৃষ্ট ও একটী প্রধান তরকারী।

ডোগ্‌রে কলা—কলিকাতার নিকটে জন্মে, পাকিলে এত বীজ হয় যে খাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মোচা সুস্বাদু, মোচার জন্যই চাষ করা হয়।

সোনা কলা—দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার রং, মর্ত্ত্যমানের জাতীয়, বোম্বায়ে জন্মে।

বীচাকলা—প্রথমে কাঁচকলার মত দেখিতে, পাকিলে লালের আভা-যুক্ত হলুদ রং হয়, বীচিতে পরিপূর্ণ, বীচি বাছিয়া খাইলে শাঁস অতীব সুমিষ্ট, পাড়াগাঁয়ে স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় ভালবাসে।

অগ্নীশ্বর—লাল রং, ওজনে প্রায় ৩ ছটাক, গরম ভাতে ডুবাইলে ঘৃতের মত গলিয়া যায়, ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু।

ঘিএ—ইহাও অগ্নীশ্বরের তুল্য গুণ ও তুল্য-স্বাদ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু ছোট।

অণুপাম—মর্ত্তমান কলার জাতীয়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।

বত্রিশছড়ী—বাঁকুড়া জেলায় জন্মে, এক কাঁদিতে ঠিক বত্রিশ ছড়া কলা জন্মে, চাঁপা কলার জাতীয়।

শিঙ্গাপুরী—শিঙ্গাপুর হইতে আসে, বড় বড় কলা হয়, পাকিলেও দেখিতে সবুজ, কিন্তু ভিতরে মোলায়েম ও সুস্বাদু।

কানাই বাঁশী—প্রায় এক হাত লম্বা হয় কিন্তু সরু, বেশ হরিদ্রাবর্ণ, খাইতেও ভাল।

মদনা—কাঁঠালী কলারই জাতীয়, অপেক্ষাকৃত একটু বড়।

তুলসী কলা—ছোট ছোট কলা হয়, বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধি, পশ্চিম দেশে পাওয়া যায়।

দয়ে কলা—যশোহর জেলায় জন্মে, ইহা এক প্রকার বীচা কলা, কিন্তু শাঁস টুকু অতীব মিষ্ট নরম ও সু-তার, চিনি সহ জলে গুলিলে অতি উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়।

সয়া কলা—ইহাও এক প্রকার বীচা কলা, কাঁচা ফলের রস নানারূপ চক্ষুরোগে উপকারী।

সিঁদুরে কলা—দেখিতে ঘোর লালবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, ফল বড়, খাইতে ভাল, ইহাকে চীনাকলাও বলে।

বেসিনে কলা—এই কলা বেসিনদেশে জন্মে, স্বাদ অপেক্ষা ইহার গন্ধ অতি মনোহর; পুষ্প ফেলিয়াও ইহার ঘ্রাণ লইতে ইচ্ছা হয়।

রসথলী—মান্দ্রাজে জন্মে, বড়ই সু-রসাল, দেখিতে প্রায় চাঁপার ন্যায়।

যবদ্বীপে কলা—যবদ্বীপে একপ্রকার আশ্চর্য্য কলা জন্মে; এক গাছে একটী মাত্র ফল হয়, অর্থাৎ সমগ্র মোচাটা যেন জমাট বাঁধিয়া একটী ফলে পরিণত হয়। বাহিরে কলা প্রায় দৃষ্ট হয় না, কাণ্ডের ভিতরেই পুষ্ট ও পক্ক হইতে থাকে; সম্পূর্ণ পাকিলে, গাছ ফাটিয়া বাহির হয়। ইহা এত বড় যে, একটী কলায় ৪ জনের পূর্ণ আহার হয়। তথায় আর একপ্রকার কলাগাছ আছে, তাহার পাতার উল্টাদিকে খোঁচা দিলে মোমের মত পদার্থ বাহির হয়, তাহাতে বাতি প্রস্তুত হয়।

ফিলিপাইনে কলা—ফিলিপাইন দ্বীপে তদপেক্ষাও ১টী বড় কলা একগাছে উৎপন্ন হয়, ইহা এত ভারি যে, ঠিক্ ৪ জনের বোঝা।

বেগুণে কলা—ইহা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হয়, দেখিতে ছোট, খাইতে খুব সুস্বাদু। তত্রত্য বড় লোকেরা ইহা অত্যন্ত ভালবাসে।

ওরঙ্কো—আমেরিকায় "ফ্লোরিডা" দেশে ওরঙ্কো নামে এক প্রকার কলা হয়, ইহা গাছে পাকিলে ইহার সদ্‌গন্ধ এতই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় যে, শুধু মানুষ কেন পশুপক্ষীরাও তদ্দ্বারা উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে।

প্রয়োগ—কলা কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?—এ প্রশ্ন করিলেই সর্ব্বাগ্রে স্বভাবতঃই মনে উঠে যে, ইহাকে দিব্য ঘনদুগ্ধের সহিত চট্‌কাইয়া উদরসাৎ করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা পক্ব রম্ভার সদ্ব্যবহার আর কিছু কল্পনায় আসে না। প্রাণিজগতে যেমন গরু, উদ্ভিজ্জগতে তেমনি কলাগাছ—উভয়েই মৃদু-প্রকৃতি, মনুষ্যের চিরসেবক। গরুর যেমন সর্ব্ব অবয়বই মনুষ্যের ব্যবহারে আসে, কলাগাছেরও তেমনি! তাই বুঝি কলা ও দুধে এমন সুন্দর মিলন! কলার থোড়, মোচা, গেঁড়, পাতা, খোলা, ডাঁটা, ফল, ফুল, ভিতরকার জল সবই উপকারী, কিছুই ফেলিবার নয়। ইহার থোড় অতি উত্তম তরকারী, আমিষ নিরামিষ উভয়রূপেই বেশ মজে। থোড় জ্বর, হাঁপানি মূত্রকৃচ্ছ্র ও বাতপিত্ত ঘটিত সমস্ত রোগে উপকারী। মোচার ঘণ্ট অতীব মধুর খাদ্য, অথচ বড়ই নির্দ্দোষ, সর্ব্বরোগেরই সুপথ্য। কলার গেঁড়ের (শিকড়ের) রস বহুমূত্র রোগে উপকারী, ইহা পরিষ্কার চিনির সহিত সেবন করিলে হিক্কা আরোগ্য হয়। ইহার তরকারী করিয়াও খাওয়া যায়।

জগদীশ্বর দরিদ্রের আহারের জন্য সোনা-রূপার থালা কলার গাছে রাখিয়াছেন,—বলা বাহুল্য যে, উহা তাহার পাতা। অধিকন্তু, হিন্দুশাস্ত্র মতে উহা ধাতব পাত্রাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, হবিষ্যান্ন-ভোজন বা যাগযজ্ঞ পূজাদির উপাদান সংস্থাপন, কলার পাতেই হইয়া থাকে।

ঘা, ফোড়া, ফোস্কা প্রভৃতি বাঁধিতে হইলে কলার মাজ (কচিপাতা) আবশ্যক হয়। আজকাল অনেক হাঁসপাতালে ইহার ব্যবহার হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে পর্প্পটী নামক ঔষধ প্রস্তুত কালে কচি কলাপাতা দ্বারা গোবরের শিল নোড়া আবৃত করিতে হয়।

যাঁহারা পরের হুকায় তামাক খান্ না, তাঁহাদের অপরের বাড়ী গিয়া উক্ত নেশার অভ্যাস রাখিতে হইলে, কলার গাছকে স্মরণ করিতে হয়।

সর্ব্বোপরি একটী বড়ই আশ্চর্য্য কথা!—কলার পাতায় অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্লে ইহাদ্বারা একপ্রকার চমৎকার চিঠীর কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে ডাঃ হাণ্টার মান্দ্রাজ মহাপ্রদর্শনী হইতে কলার পাতে যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ একপ্রকার পার্চমেণ্টের তুল্য, আর এক প্রকার ঠিক্ যেন রূপার পাতের মত। খোলা ডাঁটা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা বেশ্ কাপড় কাচা হয়, পাড়াগাঁয়ে দরিদ্র গৃহস্থেরা এবং ধোপারাও ইহা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। শুনা যায় আজকালকার চলিত লবণ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে প্রাচীন কালে কোন কোন দেশে কলার ছাই ভাঁটিতে চোয়াইয়া এক প্রকার তীক্ষ্ণ ক্ষার বাহির করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা হইত। এই ক্ষার প্লীহা যকৃৎ ও অম্লপিত্তে উপকারী। আর এক আশ্চর্য্য কথা—খোলা ও ডাঁটা হইতে যে উত্তম সূতা প্রস্তুত হয় তাহাতে দড়ী কাছি ও কাগজ হয় এবং ঐ সূতায় সুন্দর কাপড় হয়। ঢাকায় কলার সূতায় এক প্রকার বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় তৈয়ার হয়। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মহাপ্রদর্শনীতে ঢাকার শিল্পী কলার সূতায় যে এক অপূর্ব্ব রুমাল দিয়াছিল তাহা আজপর্য্যন্তও আছে, উহার মূল্য ৫০৲ টাকা। পৌষ সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থ মহিলারা স্বামি পুত্রের হিতকামনায় কলাখোলার নৌকা জলে ভাসাইয়া থাকেন।

কলা কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই আমাদের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। বিশেষতঃ কাঁচকলা বিশেষ পুষ্টিকর, ইহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লৌহের গুণ আছে। যে মস্তিষ্ক ও মেধার বলে ভারতের আর্য্যমনীষিগণ অপূর্ব্ব তথ্য-সমুদায় আবিষ্কার বা অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় বিরচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভূয়িষ্ঠরূপে এই কাঁচকলা দ্বারাই পোষিত হইয়াছিল—শাস্ত্রসেবী সাত্ত্বিক পণ্ডিতকুলের কাঁচকলা যে আহার্য্যান্নের চির-সহচর, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়-বৈরাগ্য, শাস্ত্র-সেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় সংযমাদি যাহা কিছু মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য বা কাম্যরত্ন, কাঁচ-কলা ঘৃত সৈন্ধব ও আতপান্ন এই চারিটীই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবার সাধনীভূত। শুনা যায় বিলাতে কোনও ইংরাজ সর্ব্বদা গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন কিন্তু

কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এইরূপে কিছুকাল ব্যর্থ যাওয়ার পর, কোনও বিলাতাগত বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হয় ও হিন্দুশাস্ত্র বুঝিবার অসামর্থ্য বিষয়ে তাঁহার কাছে পরিতাপ করেন। তখন ঐ সাধু বলিলেন, সাহেব! যদি ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিবে, তবে প্যাণ্টেলুন ছাড়িয়া এই গৈরিক বসনটী পর, আর মাংসাদি ত্যাগ পূর্ব্বক কাঁচকলা-আতপতণ্ডুলাদি ভক্ষণ করিতে থাক ও শাস্ত্র পাঠ কর। এইরূপ করিতে করিতে সাহেবের শাস্ত্রে প্রবেশিনী প্রতিভা আপনা হইতেই ক্রমে উপনীত হইল।

পাকা কলার খণ্ড অনায়াসে গেলা যায় বলিয়া, লোকে অরুচিকর তিক্ত বা ঘৃণাজনক ঔষধ সমস্ত কলার ভিতরে পুরিয়া খাওয়াইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পূজার নৈবেদ্যে পাকা কলা দেওয়া অপরিহার্য্য,—এ ফল দেবতারও স্পৃহণীয়! কলাগাছ গণেশ ঠাকুরের স্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বোম্বাযে পতিরতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুঃপ্রদ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তথায় মাঠে প্রচণ্ড রৌদ্র নিবারণ করিয়া অন্য গাছকে রক্ষা করিবার জন্যও মধ্যে মধ্যে কলাগাছ রোপণ করা হয়। বর্ষাকালে বঙ্গের নিম্নস্থান সমূহ জলপ্লাবিত হইলে, লোকে কলাগাছের ভেলা ভাসাইয়া আত্মরক্ষা বা গতিবিধি করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পাকা কলা হইতে একরূপ সুখ-সেব্য মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেখানে কলা শুলিয়া রৌদ্রে দিয়া নানা আকৃতি-বিশিষ্ট পাটালিও প্রস্তুত করে। মেক্সিকো দেশে, ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পাকা কলা শুকাইয়া পালো (গুঁড়া) করিয়া রাখে। বস্তুতঃ পাকা কলা শুকাইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণদ্বারা সুমিষ্ট "খাবার" প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালীরা যদি বিলাতে পাঠাইতে পারেন, তবে বোধ হয় উহা একটী উৎকৃষ্ট লাভের ব্যবসায় দাঁড়ায়। আমাদের দেশে হনি ফুড্, মেলিন্‌স্ ফুড্ প্রভৃতি কত অকিঞ্চিৎকর খাদ্য বিলাত হইতে আসিয়া বিক্রীত হইতেছে, আর আমাদের দেশের লোক এমন সুবিধার দিকে লেশ-মাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল পরীক্ষায় পাশ ও উমেদারী করিতেই চিরপ্রয়াসী। ইংরাজেরা পাকা কলাকে এত ভালবাসে বলিবার নয়। ঘরে বসিয়া শুধু কলার চাষ করিয়াও অনায়াসে তাহাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা যায়, তজ্জন্যই এই উক্তি—"তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে, থাকগে চাষা ঘরে শুয়ে।"

কলার খোলার ভিতরকার জল বড় শৈত্যকর, ইহা মস্তকে মাখিলে উন্মাদ রোগীর মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা হয়। শাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ হিমসাগর তৈলে এই জল বা কদলীমূলের রস আবশ্যক হয়।

কলার মোচার ফুল বা অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কদলীর রস বহুমূত্ররোগে বিশেষ উপকারী। কবিরাজগণ সচরাচর ইহার রস উক্ত রোগের বটিকা সমূহের অনুপানার্থ ব্যবস্থা করেন। সুপক্ক কলা ও পুরাতন তেঁতুলের শাঁস জলসহ খাইলে বায়ুপিত্ত জন্য আমাশয় রোগ ভাল হয়। দধি, চিনি, সুপরিপক্ক কলা ও পুদিনার রস পিষিয়া খাইলে আমাশয় ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। বহুমূত্রের শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ যথা—(১) কদলীনাং ফলং পক্কং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করা পয়সা পীত মপাং ধারণমুত্তমম্। অর্থাৎ পাকা কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ এক পোয়া এই সমুদায় অতি উৎকৃষ্ট মূত্রধারক হইয়া থাকে। (২) কদলানাং ফলং পক্কং বিদারীঞ্চ শতাবরীং। ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাত রপাং ধারণ মুত্তমম্॥ পক্ক কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ও শতমূলীর রস সমভাগে দুগ্ধসহ সেবনে অতিরিক্ত মূত্রস্রাব নিবারিত হয়। (৩) তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাত র্মূত্রাতিসার নাশনম্॥ কচি তালের কাঁদের (কন্দের) রস, খেজুর মূলের রস ও পাকা কলা দুগ্ধসহ খাইলে মূত্রাতিস্রাব নিবারিত হয়।

কলা অতিভোজন জন্য রোগে হাকিমেরা মধু আদা ও গঁদের জল খাইতে দিয়া থাকেন। পাকাকলা ও নেবুর রস চটকাইয়া খাইলে কতকটা আম্ররসের মত লাগে; উহা অম্লে রুচিকারক এবং যাহাদের আমাশয়ের ধাতু ও সর্ব্বদা পেট গরম হয় তাঁহাদের বড় উপকারী। অতিরিক্ত কলা খাওয়া জন্য অজীর্ণে আয়ুর্ব্বেদে সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে।

বহুমূত্রের কদলীকন্দঘৃতে ও হেমনাথ প্রভৃতি ঔষধে কলার মোচার প্রয়োজন হয়। কাস, শোথ, গলগণ্ড, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগীর পক্ষে কলা কুপথ্য।

ভাষানুবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনে করিবেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। দেখাইতে গেলে প্রবন্ধটীর কলেবর বৃদ্ধি হয় তাই বিরত হইলাম। এক কথায় বিজ্ঞান এখনও আমাদের শাস্ত্রান্তর্গত বহুতর বিষয়ের ছায়াস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে যে দু'একটী তত্ত্ব, বিজ্ঞানের সাহায্যে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অবিদিত ছিল ইহা নহে। আর্য্য ঋষিগণ তত্তৎ বিষয়ের কর্ত্তব্যতামাত্র প্রকটিত করিতে উদ্যত হইয়া উপকারিতাকে গৌণভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য, পাপাঙ্কুরসকামধর্ম্মের প্রাবল্য দূরীভূত করিয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মেরই জয়পতাকা উড্ডীন করা। তবে সম্প্রতি যুগ মাহাত্ম্যে পাপসকামধর্ম্মের অনন্য আধিপত্যে অধঃপাতের পথ পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া, গৌণ পক্ষই মুখ্য ও মুখ্যপক্ষ গৌণ এবং অনাদরণীয় হইতে বসিয়াছে। তাহা না হইলে ইদানীন্তন একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক আমেরিকান্ সাহেবের নিকট গঙ্গাজলের লঘুতা ও পাচকতা ইত্যাদি উপকারের কথা একবার মাত্র শুনিয়া আমাদিগের নব্য সমাজ তাহার পক্ষপাতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? আর আবহমানকাল ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিমণ্ডলী যে, এই পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্রস্পর্শে ইহকাল ও পরকাল পবিত্র করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতেই বা সমাজ সন্দিহান ছিলেন কেন? ফল একই হইল, কেবল গঙ্গাজলের মুখ্য পবিত্রতা দূরে গিয়া গৌণ উপকারিতাই এ ক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিল। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞান আপাতঃ মধুর গৌণপক্ষকে তন্ন তন্ন ভাবে দেখাইয়া পাপসকামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী সেই প্রত্ন ঋষিগণ অনায়াসে সমস্ত অবগত হইয়া থাকিলেও এ পক্ষকে গৌণ রাখিয়া, মুখ্যপক্ষ নিত্য কর্ত্তব্যতাকেই বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব বুঝিবার দোষে ভাষানুবাদের উপকারাভাসেই অনেকেই মুগ্ধ হইতেছেন। ফলতঃ তাহাতে অপকারই হইতেছে। আরও

দেখুন, অনেকেরই ধারণা পূর্ব্বে না কি যাঁহারা কিছু জানিতেন তাহা প্রকাশ না করিয়া অনেককে উৎকণ্ঠিত করিতেন। ভাষানুবাদের প্রভাবে আজ তাহা নাই। ইহা সত্য হইলেও পূর্ব্বপ্রথা মন্দ ছিল না। তদ্দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা ছিল, এবং যথাপাত্রেই তাহা অর্পিত হইত। সম্প্রতি আব্রহ্মচণ্ডাল সকলেই বেদে অধিকারী, সকলেই বেদতত্ত্ববিদ্। পারিজাত মঞ্জরীতে আজ একা ইন্দ্রাণীর অধিকার নাই! শুনী, শুকরী, বানরী, সকলেরই অধিকৃত হইয়া পদদলিত হইতেছে। বৈজয়ন্তী আজ ভগবানের কণ্ঠচ্যুত হইয়া বানরের হস্তে খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ইহাই যদি সদ্বস্তুর সদ্ব্যবহার, তাহা হইলে স্বীকার করিলাম ভাষানুবাদ আমাদের প্রভূত উপকারী। হায়! বলিতেও দুঃখ হয়, বেদের নাম হইয়াছে আজ 'চাষার গান'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন উঠিয়া গিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জীব ও ব্রহ্ম আর ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় উঠিয়া গিয়া মন ও বুদ্ধি হইলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি হইলেন আশা। এইরূপ অভিধান ছাড়া অভূত পূর্ব্ব অচিন্তনীয় অর্থের অবতারণা করিয়া ভাষানুবাদ যদি আমাদের উপকার করিয়া থাকে এবং তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। তাহা না হইলে ভাষানুবাদ যে, প্রকারান্তরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে ইহা কে না বলিবে?

অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যাহা আমাদের একটা বিস্মৃতির ভয় ছিল ভাষানুবাদের দ্বারা আজ তাহা নাই। বিস্মৃতির ভয় নাই সত্য; পরন্তু ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া মানসিক উন্নতির অনন্য নিদান সেই গবেষণাই আমাদের উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে আর যে কোনও বিষয় চিন্তা পথে আসিয়া প্রতিভার বিকাশ সাধন করিবে ইহার আশা নাই। বোধ হয় কিছু দিন পরে প্রত্যেক কথাতেই পুস্তক খুলিতে হইবে। পূর্ব্বে কোনও এক বিষয়ের চিন্তা করিতে বসিলে তদানুষঙ্গিক কত বিষয়ই জানিতে সক্ষম হওয়া যাইত, সম্প্রতি ভাষানুবাদে নিশ্চিন্ত হইয়া আমাদের ধীশক্তি এতই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে যে, নিগূঢ় বিষয় ভাবা দূরের কথা, সামান্য একটী বিধি ব্যবস্থা দিতে হইলে বা যৎসামান্য একটী শব্দার্থ জানিতে হইলে পুস্তকের পাতা না উল্টাইয়া আর রক্ষা নাই। পূর্ব্বে পাণ্ডিত্য ছিল অন্তরে, সম্প্রতি পাণ্ডিত্যের নিবাসভূমি পুস্তক। যখন পরহস্তগত ধন ধনই নয়, পুস্তকস্থা বিদ্যা বিদ্যাই নয়,

তখন কি করিয়া বলিব যে ভাষানুবাদের দ্বারা বিদ্যার উন্নতি হইতেছে। পুস্তকের সদ্ভাবে পাণ্ডিত্য, পুস্তকাভাবে মূর্খতা ইহাই ত হইল ভাষানুবাদের পরিণাম! জানি না, ভাষানুবাদের দ্বারা সারনিচয় তাম্রফলকে খোদিত হইতেছে কি জলে মিলিত হইতেছে। উপসংহারে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভাষানুবাদে যাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহারা যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন, তাহা হইলে দরিদ্রগণের "ভূমিখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ং" এই উক্তিরই বা দোষ কি?

সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমূহ উপস্থাপিত করিলাম, একবার চিত্তরূপ তুলাদণ্ডে ফেলিয়া দেখুন কোন্ পক্ষ গুরু, এবং কোন্ পক্ষ লঘু হয়। যদি আমাদিগকে মীমাংসা করিতে বলেন, তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে—

"স্তুবন্তি গুর্ব্বী মভিধেয় সম্পদং বিশুদ্ধি মুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতি পুরুষং রুচৌ সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ॥

প্রহরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা মহাপাত্র।

সুজন-প্রশংসা।

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুস্তথা।
পাপং তাপঞ্চ দৈন্যঞ্চ হন্তি সাধোঃ সমাগমঃ॥ ১॥

গঙ্গা নাশ করে পাপ, চন্দ্রমা বিনাশে তাপ,
কল্পতরু দৈন্য দেখি তাহা দূর করে।
কিন্তু মহাশয় যিনি তিনেরে সম্যক্ জিনি
পাপ তাপ আর দৈন্য সকলই হরে॥ ১॥

উদেতি সবিতা তাম্র স্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥ ২॥

উদয়ের কালে সূর্য্য লোহিত যেমন,
অস্ত-সময়েও দেখ লোহিত তেমন।

কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, সকল সময়
মহতের একভাব, জানিও নিশ্চয় ॥ ২ ॥

অঞ্জলিস্থানি পুষ্পাণি বাসয়ন্তি করদ্বয়ম্।
অহো সুমনসাং বৃত্তির্বামদক্ষিণয়োঃ সমা ॥ ৩ ॥

অঞ্জলি ভিতরে পশি থাকে যদি পুষ্পরাশি,
সুবাসিত হয় করদ্বয়।
বাম দক্ষিণের প্রতি সুমনার এক রীতি,
কভু তার অন্যথা না হয় ॥ ৩ ॥

সজ্জনস্য হৃদয়ং নবনীতং যদ্বদন্তি কবয় স্তদলীকম।
অন্যদেহবিলসৎপরিতাপাৎ সজ্জনো দ্রবতি নো নবনীতম্ ॥ ৪ ॥

কিবা নবনীত, কিবা সাধুর হৃদয়,
দুই তুল্য ;—কেহ কারে নাহি করে জয়।
যে কবি এ কথা বলে, মিথ্যা কথা তার,
তাহার কথায় আর শ্রদ্ধা রয় কার ?
পরচিত্তে অল্প মাত্র তাপ যেই হয়,
অমনি গলিয়া যায় সাধুর হৃদয়।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, নবনীত হায় !
সে তাপে হইয়া তপ্ত গলিতে না চায় ॥ ৪ ॥

অহো মহত্ত্বং মহতামপূর্ব্বং বিপত্তিকালেঽপি পরোপকারঃ।
যথাস্যমধ্যে পতিতোঽপি রাহোঃ কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি ॥ ৫ ॥

কি আশ্চর্য্য মহতের মহিমা অপার,
নিজ বিপদেও করে পর-উপকার।
চন্দ্র পড়িয়াও রাহু-মুখের ভিতরে
মরিতে বসেছে, তবু পুণ্য দেয় নরে ॥ ৫ ॥

পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি চন্দ্রো বিকাশয়তি কৈরবচক্রবালম।
নাভ্যর্থিতোঽপি জলদঃ সলিলং দদাতি সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতাভিযোগাঃ ॥৬॥

নলিনীর দুঃখ দেখি দেব দিবাকর,
দরশন দিয়া তার জুড়ান অন্তর।
কুমুদিনী বড় কষ্ট পাইতেছে মনে,
ইহা ভাবিয়াই চন্দ্র উঠেন গগনে।
জলদ আপনি জল ঢালে মৃত্তিকায়,
কে কোথা তাঁদের কাছে গিয়া ভিক্ষা চায়?
মাহাত্মা পরের দুঃখ আপনি ভাবিয়া,
মনে সুখ পান তাহা মোচন করিয়া। ৬।

ধবলয়তি সমগ্রং চন্দ্রমা জীবলোকং কিমিতি নিজকলঙ্কং নাত্মসংস্থং প্রমাষ্টি।
ভবতি বিদিতমেতৎ প্রায়শঃ সজ্জনানাং পরহিতনিরতানামাদরো নাত্মকার্য্যে॥৭॥

চন্দ্রদেব নিজরশ্মি করিয়া বিস্তার
নিষ্কলঙ্ক করি দেয় জগৎ সংসার।
নিজের শরীরে কিন্তু কলঙ্ক যা রয়,
চেষ্টা নাহি তাঁর তাহা করিবারে লয়।
পরহিতে রত রন্ যাঁরা সর্ব্বক্ষণ,
নিজকার্য্যে কভু তাঁরা নাহি দেন মন। ৭।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তত্ত্বমঞ্জরী—ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। রামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রকাশিত; বার্ষিক সাহায্য এক টাকা মাত্র। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সুললিত উপদেশাবলী ইহাতে রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও বেশ শিক্ষাপ্রদ। এরূপ মাসিক পত্রিকার প্রচার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। ১৯০০, মার্চ্চ। ১৩০৬, চৈত্র।

মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—ভোজন-যজ্ঞ, অনুতাপে উদ্ধার, শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ স্তোত্রম্, চরকীয় নীতি, দ্রব্যগুণ বিচার।

"ঋষি"-পত্রিকার নিয়ম।

১। "ঋষি" বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের "ঋষি" না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার (অন্যূন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ "নূতন" এই কথাটির উল্লেখ করিবেন।

ঋষি

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। } { ১৩০৬, চৈত্র।

ভোজন-যজ্ঞ।

ভোজন একটী বড় কম ব্যাপার নয়। প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা মহাযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। যা-পাই তাই তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিলেই হইলনা; কি খাইতেছি? কখন খাইতেছি? কিরূপে খাইতেছি? কি উদ্দেশ্যে খাইতেছি—এই বিতর্কগুলি আহারারম্ভে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষাপূর্ব্বক একবার মনে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ যেমন অসময়ে অনবস্থিত চিত্তে অযথাভাবে সত্বর "নমো নমঃ" করিয়া উঠিয়া পড়িলে কখনই উপাস্য দেবতার আবাহন সংকল্প সাধিত হয় না, তেমনি ভোজন-যজ্ঞের আয়োজন-নিষ্পাদনে ত্রুটি হইলে ঐ মহারম্ভের অভিপ্রায় কদাপি সম্পূরিত হয় না। এই যজ্ঞের যজ্ঞপতি অধিষ্ঠাতৃদেব জঠরাগ্নিরূপী ব্রহ্মা, ইহার উপচার সামগ্রী চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয়াদি ষড়্‌জাতীয় আহার্য্য, ইহার দক্ষিণা চিত্তপ্রসাদ, কাম্যবস্তু আয়ু ও অনাময়, ক্ষুধা এই যজ্ঞের ভক্তিস্থানীয়, এ যজ্ঞের যাজক স্বয়ং ভোক্তা, নিত্রুয় লজ্জা পুরো[illegible] চলেনা।

চরক লিখিয়াছেন—

* আহিতাগ্নিঃ সদা পথ্যান্যন্তরাগ্নৌ জুহোতি যঃ।
দিবসে দিবসে ব্রহ্ম জপত্যথ দদাতি চ॥
নরং নিশ্রেয়সে যুক্তং সাত্ম্যজ্ঞং পানভোজনে।
ভজন্তে নাম যাঃ কেচিৎ ভাবিনোঽপ্যন্তরাদৃতে
ষড়্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ॥

[illegible]

আহিতাগ্নি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণ যেমন প্রাতঃ সন্ধ্যায় প্রণবাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমাগ্নির মধ্যে যথাবৎ আহুতি দান করিয়া তৎফলস্বরূপ ইহ-পরত্র স্বাস্থ্য ও স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন, তদ্রূপ যিনি উদরাগ্নিকে সযত্নে সংরক্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে উহাতে দিন দিন সুপথ্যরূপ অঞ্জলি উৎসর্গ করেন, সেই পান ভোজন হিতাহিতজ্ঞ মঙ্গল-নিরত ব্যক্তি অপথ্য ও অধর্ম্ম এতদুভয়েরই অভাব নিবন্ধন ইহকালে ও পরকালে দৈহিক বা মানসিক কোনও কষ্টের দ্বারাই আক্রান্ত হয় না,—সেই জিতাত্মা হিত-ভোজী পুরুষ নীরোগদেহে শতবর্ষ জীবন ধারণ পূর্ব্বক সজ্জনগণের সন্নিধানে সম্মানার্হ হইয়া থাকেন।

ধনবান্ ব্যক্তি স্বকীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে মণিরত্নাদি বহুমূল্য পূজা-সম্ভার সংগ্রহপূর্ব্বক দেবার্চ্চনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, হউন্! ইহাতে আপত্তি কি? কিন্তু দেখা উচিত এই সাড়ম্বর পূজার মূলে সেই আসল্ জিনিস্ ভক্তিটী আছে কি না। যদি তাহা না থাকে সমস্ত আয়োজনই অন্ধের নেত্র বিস্ফারণবৎ পণ্ড। সেইরূপ যদি ক্ষুধার অভাব হয়, তবে বিলাসবুদ্ধি প্রণোদিত সহস্র রাজ-ভোজোই বা কি ফল? প্রাণে ভক্তি থাকিলে, তুলসীমাত্র নিক্ষেপেও স্বর্গের সিংহাসন নড়িয়া উঠে, তেমনি ক্ষুধা থাকিলে শাকভাতেই আত্মার পরিতৃপ্তি ও দেহের দিব্যকান্তি হইয়া থাকে।

দেবপূজা যেমন একাগ্রচিত্তে করিতে হয়, আহার সম্বন্ধেও চরকের সেইরূপ উপদেশ—"তন্মনা ভুঞ্জীত" অর্থাৎ তন্ময়চিত্তে ভোজন করিবে। কামক্রোধাদি বিলোড়িত হৃদয়ে সেই একাগ্রতা অতীব দুর্লভ, এবং তদভাবে পূজাই বা কোন্ কার্য্যের?

পুনরায় ঋষি বলিতেছেন—

মাত্রয়াপ্যভ্যবহৃতম্ পথ্যং চান্নং ন জীর্য্যতি।
চিন্তাশোক ভয় ক্রোধ দুঃখ শয্যা প্রজাগরৈঃ॥

দুশ্চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, কষ্ট-শয়ন বা রাত্রি জাগরণ দ্বারা দেহমন প্রপীড়িত হইলে যথামাত্রায় ভুক্ত হিতকর খাদ্যও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

পূজার আয়োজন সযত্ন-সম্পন্ন পবিত্র ও শ্রদ্ধাকর হওয়া চাই আহার্য্যগুলি ও শুচি মনঃপূত রুচিকর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়

আজকাল আহার্য্যের শুচিত্ব বিষয়ে মহান্ বিঘ্ন লোকসমাজে সমুপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীদিগের বিলাসপ্রিয়তা ও পুরুষগণের শূন্যগর্ভ অভিমান বুদ্ধির কুফলে সামান্য উপার্জ্জনক্ষম গৃহস্থ ও স্বার্থানুসারী পাচকের হস্তে এই যজ্ঞের আয়োজনভার বিন্যস্ত রাখেন। এরূপ বহুবার দেখা গিয়াছে—পাচকের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে প্রস্রুত স্বেদ বিন্দু বা মুখ-নিক্ষিপ্ত থুৎকার প্রস্তুত খাদ্য মধ্যে পতিত হইলে, কোনও কীট পতঙ্গের ছিন্ন পালক দ্বারা বিড়াল কুক্কুরাদির জিহ্বা-লালা দ্বারা কোনও খাদ্য সংমিশ্রিত হইলে কয়জন পাচকের ধর্ম্মভীরুতা জাগরিত হইয়া উঠে—কয়জন তখন গৃহস্বামীকে জানাইয়া নূতন আহারায়োজন করিয়া দেয়? ইতঃপূর্ব্ব সময়ে গৃহস্থালীমধ্যে প্রাচীনা গৃহিণী সুযোগ্যা পুত্রবধূ বা কন্যা প্রভৃতি স্বজনগণই পর্য্যায়ক্রমে দিন দিন রন্ধনের ভার লইতেন, এপ্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিল। জায়াজননী-প্রভৃতি প্রিয়জনের স্বহস্ত-সম্ভাবিত যথালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ অন্নের মধ্যেও বুঝি তাঁহাদের প্রাণের অপূর্ব্ব স্নেহরস অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায় তাই তাহা এত মধুর! এত স্পৃহণীয়!

বিষয়লিপ্সু, উদ্যমশীল কর্ম্মযোগীরা অনেক সময় অর্থাদি উপার্জ্জনে একাগ্রচিত্ত ও অনন্যচেষ্ট হইয়া সম্মুখ-স্থিত সুখসেব্য ভোজ্যনিচয়ের লেশমাত্র শশব্যস্তভাবে আস্বাদন পূর্ব্বক সত্বর লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন। এরূপ করা তাঁহাদের পক্ষে একটা মহা অপরাধের কার্য্য। তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত—আহারের প্রভাবেই মানুষের বলবুদ্ধি উদাম। সোজা কথায়—কয়লার জোরেই গাড়ী চলিয়া থাকে। কয়লার অসদ্ভাবে বা অসম্যক্‌সংগ্রহে উহা কতকাল চলিবে? দেহ পাত হইলে কোথায় অর্থ? কোথায় কাম? কোথায় কিছু? শরীরই নিখিল কাম্যবস্তুর ভিত্তিস্বরূপ, যে কোনও উপায়ে শরীর রক্ষা আবশ্যক! তাই বুঝিয়াই বোধ হয় চার্ব্বাক বলিয়াছিলেন—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

নাস্তিক চার্ব্বাক শরীর রক্ষারূপ পুণ্যকার্য্যের জন্য ঋণরূপ পাতকে অঙ্গীকার করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মভীরুযুবক! অবশ্য অতটা অকার্য্য করিও না, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও—ভোজন চর্ব্বণগিলনাত্মক একটা সামান্য কায়িক ব্যাপার নহে, ইহা এক সুমহৎ নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্ম স্বরূপ।

সেই এঞ্জিনিয়ার প্রবর জগৎপিতা এই ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জীব-জঠরে ক্ষুধা দিয়াছেন। এই ক্ষুধার তুল্য চাবুক আর নাই। মানুষ এ চাবুকের অগ্রাহ্য করিতে কখনই পারিবেনা। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানের উপকরণসামগ্রী ও বিধি বৈলক্ষণ্য সমস্তই মানুষের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। অতএব এবিষয়ে মানুষের সদ্বুদ্ধি থাকিলেই মঙ্গল। নতুবা কায়মানসিক অধঃপতন অনিবার্য্য।

অনুতাপে উদ্ধার।

যেমন খাদ ব্যতীত গড়ন হয়না, তেমনই পাপ ব্যতীত মানুষ হয় না। মানুষের সহিত পাপের সংশ্রব আছে বলিয়াই মানুষ-মানুষ; নচেৎ মানুষ দেবত্ব লাভ করিত। তবে পাপের মাত্রা অতিরিক্ত হইলেই তাহা প্রকৃত "পাপ"নামে পরিগণিত হইয়া ধর্ম্মরাজের দণ্ডযোগ্য হয়। যে কোন বিষয়ের অতিরিক্ততা মাত্রই যখন দূষণীয়, তখন পাপের মাত্রা যে অধিক হইলে মানুষের যন্ত্রণার সীমা থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য। সামঞ্জস্যেইসুখ রৌদ্র ও মেঘের সামঞ্জস্যেই ধরণী উর্ব্বরা স্বামীস্ত্রীর পবিত্র হৃদয়ের সামঞ্জস্যেই সংসার সুখময়। মানুষ যখন এই সামঞ্জস্যের শান্তিময় শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয় তখনই তাহার পাপের বোঝা ভারি হয় এবং সেই পাপের বোঝা যখন পূর্ণ হয় পাপ যখন আধারে আর ধরেনা উছলিয়া উছলিয়া পড়ে তখনই মানুষ আপন পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়া মরমে মরমে দগ্ধ হয় যন্ত্রণায় হৃদয় ঝলসিয়া যায় বুক ফাটিয়া হৃদয় গলিয়া নয়ন ধারা রূপে প্রকাশ পায়। এই হৃদয় গলা নয়ন জলই পাপীর জীবনের শান্তিজল এই নয়ন জলেই হৃদয়ের পঙ্কিলতা বিধৌত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। এবং যখন এই নয়ন জল মানবের ভাগ্যে প্রকাশ হয় তখনই মানব ভগবচ্চরণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে পারে "প্রভু কত পাপ করিয়াছি আমার গতি কি হইবে আমাকে ক্ষমা কর যেন আর এমন দুর্ম্মতি নাহয়।" এই অনুশোচনার নামই যথার্থ অনুতাপ। পাপ যখন আধারে ধরে না তখনই অনুতাপের প্রকাশ হয়। পাপী যতই পাপ করুকনা এক দিন না এক দিন স্বীয় কর্ম্মার্জ্জিত ফলে অবশ্যই অনুতপ্ত

হইবে। কুরুরাজ দুর্য্যোধন নিরপরাধী পাণ্ডব গণের সহিত প্রতিনিয়ত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া বনবাস দিয়াও চিত্ত শান্ত হইল না শেষে দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া কুরু পাণ্ডবের মহাসমরের সৃষ্টি করিলেন ভারতের সেই মহাসমরে বহু ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল হইল তথাচ তাঁহার আশা মিটিলনা পাপের অনুশোচনা প্রকাশ পাইলনা ক্রমে উভয় পক্ষের সমগ্র বাহিনী নির্ম্মূল হইলে নৃপতি দুর্য্যোধনের পক্ষে গুরু পুত্র অশ্বথামা ও গুরু-সখা কৃপাচার্য্য জীবিত ছিলেন এই সময় পাণ্ডববীর ভীমের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হইয়াছিল সুতরাং তিনি তখন চলৎ শক্তি রহিত তথাচ তিনি মনের অদম্য গতিকে নিবৃত্ত করিতে নাপারিয়া গুরুপুত্র অশ্বথামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া পাণ্ডব বিনাশের আদেশ করিলেন। বীর অশ্বথামা ধরণীকে অপাণ্ডবা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রজনী যোগে পাণ্ডব বিনাশার্থ গমন করিলেন। তিনি আপন প্রতিভা ও স্তববলে পাণ্ডব রক্ষক দ্বারী পশুপতিকে (শিবকে) প্রবোধ করিয়া তস্করের ন্যায় পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সেসময় পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ ওপত্নী এবং কৃষ্ণসখা সাত্যকী সহ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। শিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিদ্রিত ছিলেন অন্ধকার রজনীতে অশ্বথামা সেই পঞ্চ ভ্রাতাকে হস্ত দ্বারা ক্রমান্বয়ে স্পর্শকরিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চ পাণ্ডব বিবেচনা করিয়া স্বীয় কোষবদ্ধ খড়্গ নিষ্কাসিত পূর্ব্বক সেই পঞ্চ ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক নৃপতির নিকট চলিলেন। আজ পঞ্চ পাণ্ডবের কর্ত্তিত মুণ্ড দর্শনে না জানি নৃপতি কতই আনন্দিত হইবেন। তৎকালে এইরূপ কত কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি যথা সময়ে সেই পঞ্চমুণ্ড লইয়া নৃপতিকে উপহার দিলেন তিনিও বৈরী নির্য্যাতনে প্রথমে কতই আনন্দানুভব করিলেন পরে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন এপঞ্চমুণ্ড পঞ্চপাণ্ডবের নহে পাণ্ডব পুত্র গণের। তখন তাঁহার বিষাদের সীমা রহিল না এই কার্য্যে কুরুবংশ নির্ম্মূল হইল ভাবিয়া মরমে মরিতে লাগিলেন তখনই তিনি আপনার কর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক কাতর স্বরে বিলাপ করিয়া গুরুপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে নারাখিলে"

অনুতাপে তাঁহার হৃদয় শতধা হইল ইহাই যথার্থ অনুতাপ। এই যথার্থ

অনুতাপের দ্বারাই মঙ্গল ময় শ্রীভগবান্ পাপীকে প্রসন্ন হন। এই জন্যই খৃষ্টানের বাইবেল, মহম্মদের কোরাণ, হিন্দুর শাস্ত্র পাপীকে পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

অনুতাপ দ্বারা যে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হয়েন আমরা তাহা ব্রজ গোপীগণের চরিত্রালোচনা করিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারি। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে—কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসীর দিবস রাসলীলার বাসনা করিয়া যে সকল প্রেমময়ী গোপীকা দিগকে বংশীদ্বারা আবাহন করিয়াছিলেন সেই সকল সমাগতা গোপীকাগণ আপনা দিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞানে সর্ব্ব-গোপীগণ অপেক্ষা আপনাপন শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন ইহাতে সেই দর্প হারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দর্প হরণ মানসে একটি খেলা খেলিলেন অর্থাৎ তিনি সেই সমগ্র গোপীকা মণ্ডলী হইতে তাঁহার হ্লাদিনী অংশ শ্রীরাধাকে লইয়া লীলাস্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন তখন তাঁহার অভাবে গোপীকা গণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা সহ অন্তর্ধানে সকলেই শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের পরমা প্রেয়সীজ্ঞানে আপনাদিগের নিকৃষ্টতানুভব করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এই অনুতাপের কৃপাতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শ্রীরাধিকা যখন দেখিলেন সমগ্র গোপী মণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকেই গ্রহণ করিলেন তখন তিনিও আপনার অসীম গৌরবে স্ফীতা হইয়া উঠিলেন শ্রীকৃষ্ণের তাহা বুঝিতে বাকী রহিলনা তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্ধান হইলেন। তখন শ্রীরাধিকার ক্ষোভের সীমারহিলনা পরে যথার্থ অনুতাপ দ্বারাই তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমরা জীব প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপের তরঙ্গে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি যখন প্রাণ সেই তরঙ্গের তীব্র আঘাতে ওষ্ঠাগত হইয়াপড়ে তখন আর কিছুতেই স্পৃহা থাকেনা জগতের কিছুতেই যেন প্রাণের তৃপ্তি সাধন হয় না তখন সেই শান্তিময়ের শীতল চরণ দুটি ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছাহয় সে রোদনকত মধুর কত অমৃত ময় কেমন করিয়া বলিব! কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের যেন কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে আর্ত্তনাদ সে যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে যেন কেমন একটা দেবত্বের ছায়া পড়ে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। এমন

ভাবান্তরের কারণকি ? সেই যেতুমি আপনার অবসাদ ময় জীবন খানি লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলে "আর পারি না প্রভো"—তাহা আর কিছু নহে যথার্থ অনুতাপের বেদনা মাখান সুর সে নয়ন ধারা হৃদয় জুড়ান অনুতপ্ত অশ্রুজল অনুতাপী পাপীর বেদনা মাখান সুর ভগবচ্চরণে পৌঁছায়, সে নয়ন জল তাঁহার চরণ দুটি ধৌত করিয়াদেয়। তাই তিনি প্রসন্ন হইয়া মানব হৃদয়ে তাঁহার স্নেহাশীষ প্রদান করেন তাই অনুতপ্ত জীবন খানি জুড়াইয়া যায় হৃদয়ের ভার লাঘব হয় জীবন অমৃত উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়। হায়! আমরা কতদিনে সেই যথার্থ অনুতাপের কৃপাকণা লাভ করিয়া ভগবৎ প্রসন্নতা লাভ করিব !!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)

শিবাপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

(১)

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

পূর্ব্বজন্মে করিয়াছি অন্যায় করম,
তাই মোর মাতৃগর্ভে হইল জনম।
বিষ্ঠা-মূত্র-মধ্যে বাস করি অবিরত
জঠর-অনল-জ্বালা সহিয়াছি কত!
যত কষ্ট পাইয়াছি তথা অনুক্ষণ
বর্ণন করিবে তাহা, হেন কোন্ জন ?
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর!

(২)

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যং চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগোত্থদুঃখাদ্রুদনপরিবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

বাল্যে দুঃখ-যুত, মলে মর্দ্দিত-শরীর,
স্তন্যপান হেতু কত হয়েছি অধীর।
ইন্দ্রিয় থাকিতে ছিনু জড়ের মতন,
পিপীলিকা মশকাদি করিত দংশন;
বিষম ব্যাধির জ্বালা, ক্ষুধায় কাতর,
তাই নাহি স্মরিয়াছি তোমায় শঙ্কর!
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর!

(৩)

প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতিস্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

আসিলে যৌবন, পঞ্চ বিষয়-ভুজঙ্গ
মর্ম্মে মর্ম্মে দংশে ছিল এই মোর অঙ্গ।
লইয়া যুবতী নারী, ল'য়ে পুত্র ধন
যা ছিল বিবেক-বুদ্ধি, দিনু বিসর্জ্জন।
মানে গর্ব্বে তব চিন্তা না করিল মন,
শেষে আমি প্রৌঢ় হ'য়ে পড়িনু তখন।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর!

(৪)

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়ানাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈ র্বিয়োগৈ স্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনঞ্চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈ র্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটে র্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

প্রৌঢ়কাল চ'লে গেল, বার্দ্ধক্য এখন,
তথাপি ইন্দ্রিয়-সুখে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
ত্রিতাপ বিয়োগ রোগ পাপ সমুদয়
সহিয়াও এ দেহের নাহি হ'লো ক্ষয়!
মিথ্যা মোহ-অভিলাষে করিয়া ভ্রমণ
না করিল তব চিন্তা কভু মোর মন!
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৫)

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

স্মৃতিমত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়,
চেষ্টাও করিতে মোর শক্তি নাই তায়।
দ্বিজোচিত ব্রহ্মমার্গ একমাত্র সার,
বেদোচিত কর্ম্ম পুনঃ অসাধ্য আমার।
শুনিতে চিন্তিতে ধর্ম্ম-কথা নাহি চাই,
কিবা ফল তবে ধ্যান করিয়া সদাই?
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৬)

স্নাত্বা প্রত্যুষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ পৃথুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।

নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

প্রত্যূষে করিয়া স্নান স্নপন কারণ
না আনিনু গঙ্গাজল ভুলেও কখন।
অতি সুদুর্গম বন সন্ধান করিয়া
না আনিনু বিল্বপত্র পূজার লাগিয়া।
গন্ধধূপ কিম্বা পদ্মমালা সরোবরে
না আনিতে চাহিলাম কভু তব তরে।
শিব শিব শিব শম্ভু মহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৭)

দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকচিরচিতং পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবিধরসযুতৈর্নাপি ভক্ষ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

দুগ্ধ মধু ঘৃত দধি শর্করা লইয়া
নাহি দিনু লিঙ্গ তব স্নান করাইয়া।
কনক-রচিত লিঙ্গে লেপিয়া চন্দন,
কিম্বা পুষ্প দিয়া নাহি করিনু পূজন।
না দিনু সুরস ভক্ষ্যদ্রব্য উপহার,
না দিনু কর্পূর-দীপ কিম্বা ধূপ আর।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৮)

গঙ্গাতীরেঽপ্যুষিত্বা দলকুসুমফলৈঃ ক্ষালিতৈর্গাঙ্গতোয়ৈঃ
গাঙ্গং নির্মায় লিঙ্গং শতশতশতকং নার্চ্চিতং ভূতলে মে।
নো লিঙ্গং গেহমধ্যে ধরণিতলগতৈর্মৃত্তিকাগোময়ৈর্বা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

গঙ্গাতীরে করি'বাস, গঙ্গামাটী দিয়া
শত শত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া,
দিয়া পত্র-ফল-পুষ্প ধুয়ে গঙ্গাজলে
না করিনু পূজা তব আসিয়া ভূতলে॥
মৃত্তিকা গোময়ে কিম্বা করিয়া রচন
তব লিঙ্গ না পূজিনু ভুলেও কখন।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(৯)

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যং হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপৈ স্বদর্থং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

বারেক তোমার নাম করিয়া স্মরণ
না করিনু ধনদান ব্রাহ্মণে কখন।
জপিতে জপিতে বীজমন্ত্র অনিবার
অনলে আহুতি নাহি দিনু লক্ষবার।
যথাবিধি রুদ্র-জপ করিয়া স্মরণ
গঙ্গাতীরে তপ নাহি করিনু কখন।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(১০)

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে দ্যোতরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলমতিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

নিরোধি প্রণব-বায়ু বসি পদ্মাসনে
বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হ'য়ে স্বরূপ চিন্তনে

দিব্য জ্যোতির্ময়ে হৃদি করিয়া ধারণ
পরমাত্মে আত্মহারা না হনু কখন্।
কভু না হেরিনু মোর মানস ভিতরে
তব পূর্ণ ব্রহ্মরূপ মন প্রাণ ভ'রে।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(১১)

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধ স্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি র্বিগতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

উলঙ্গ নিঃসঙ্গ শুদ্ধ ত্রিগুণ-রহিত,
মোহ-পরিশূন্য ভব-গুণ-বিবর্জ্জিত,
ধ্যানকালে ন্যস্তদৃষ্টি নাসারন্ধ্র-দেশে,
এরূপে না রহিলাম মনের হরষে।
হে শঙ্কর কলি-কাল-পাপ-বিনাশন!
মত্ত হ'য়ে না করিনু তোমার স্মরণ।
শিব শিব শিব শম্ভু ওহে মহেশ্বর!
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর।

(১২)

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
সর্পৈ র্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥

স্মরহর গঙ্গাধর শশাঙ্ক-শেখর,
ভুজঙ্গ-ভূষিত-কণ্ঠ-শ্রবণবিবর
নেত্র-বৈশ্বানর দেব ক্ষেমঙ্কর হর,
ত্রিভুবন-সার হস্তি-চর্ম্মাম্বর-ধর।

মোক্ষহেতু কর তব সুনির্ম্মল মন,
অন্য কোন কর্ম্মে আর কিবা প্রয়োজন !

(১৩)

কিং বানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভি র্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥

হস্তি-অশ্ব-ধনে কিবা রয় প্রয়োজন ?
বিশাল সাম্রাজ্য ল'য়ে কি ফল কখন্ ?
পুত্র মিত্র কলত্র পশুতে কিবা হয় ?
দেহে গেহে প্রয়োজন কিবা আর রয় ?
এই সব ক্ষণস্থায়ী জানিয়া রে মন !
শীঘ্র দূর কর তাহা, রেখো না কখন।
আত্মোন্নতি-হেতু যদি গুরুবাক্যে মতি,
ভজ ভজ ভজ সেই পার্ব্বতীর পতি !

(১৪)

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুন র্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥

দেখিতে দেখিতে আয়ু যাইছে চলিয়া,
যৌবন যাইছে চলি, দেখিনু ভাবিয়া,
চলিয়া যাইছে দিন, না ফিরিছে আর,
গ্রাস করিতেছে কাল জগৎ-সংসার,
তরঙ্গের মত লক্ষ্মী অস্থির নিয়ত,
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মত।
বড়ই বিপদ্ মোর বিপদ্-শরণ !
কর কর রক্ষা মোরে, ওহে ত্রিলোচন !

(১৫)

বপুঃপ্রাদুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পুরা
পুরারে ন প্রায়ঃ কচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্।
নমন্ মুক্তঃ সম্প্রত্যহমতনুরগ্রেঽপ্যনতিভাক্
মহেশ ক্ষন্তব্যং তদিদমপরাধদ্বয়মপি ॥

পূর্ব্বজন্মে এ দেহ যে ছিল বিদ্যমান,
এ জন্মে এ দেহ দেখি হয় অনুমান।
পূর্ব্বজন্মে হে শঙ্কর! আসিয়া ধরায়
প্রণাম না করিয়াছি প্রায় হে তোমায়
এ জন্মে প্রণমি হ'লো দেহের মোচন,
দেহ নাই, কিসে করি প্রণাম এখন।
দুই জন্মে দুই দোষ করেছি শঙ্কর,
এখন ক্ষমিতে তাহা হও হে সত্বর।

(১৬)

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা, শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব, জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

কায় মন বাক্য কর অথবা চরণে,
কার্য্যসূত্রে কিম্বা আর শ্রবণে নয়নে,
জানিয়াই হোগ্ কিম্বা হোগ্ না জানিয়া
করেছি যে সব পাপ ভ্রমেতে পড়িয়া,
সেই সব পাপ মোর ক্ষমহ সত্বর,
জয় জয় শিব শম্ভু করুণাসাগর!

(১৭)

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্।
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি ॥

যিনি শান্তি-নিকেতন, শশাঙ্ক-ভূষণ,
পদ্মাসন পঞ্চানন যিনি ত্রিলোচন,
ত্রিশূল পরশু খড়্গ পুনশ্চ কুলিশ
দক্ষিণাঙ্গে শোভা পায় যাঁর অহর্নিশ,
অঙ্কুশ ডমরু নাগ পাশ ঘণ্টা আর
মনোহর শোভা করে বামাঙ্গে যাঁহার,
স্ফটিক সমান যিনি, ভূষণ-শোভন,
ভজি আমি নিত্য সেই পার্ব্বতীরমণ!

(১৮)

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥

বন্দি উমাপতি, বন্দি সুর-শ্রেষ্ঠ-ধন,
বন্দি সর্ব্বক্ষণ সেই জগৎ-কারণ।
বন্দি মৃগধর, বন্দি পন্নগ-ভূষণ,
বন্দি সেই পশুপতি আমি সর্ব্বক্ষণ।
বন্দি সেই চন্দ্র-সূর্য্য-অনল-নয়ন,
বন্দি আমি নিত্য সেই হরি-প্রিয়-ধন।
বন্দি সেই ভক্তজন-পরম-শরণ,
বন্দি সেই শিব শম্ভু মঙ্গল-বচন।

(১৯)

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতে শ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধণি
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ॥

শুভ্র-ভস্ম-দেহ, শুভ্র সহাস্য-বদন,
নরের কপাল শুভ্র হস্তে-অনুক্ষণ,

সুন্দর খট্টাঙ্গ শুভ্র শোভে অবিরল,
শুভ্র বৃষ, শুভ্র পুনঃ কর্ণের কুণ্ডল,
শুভ্র গঙ্গাজল-ফেন, শুভ্র জটাভার,
ভালে শুভ্র চন্দ্রদেব শোভে অনিবার,
শুভ্র বস্তু ল'য়ে যাঁর প্রীতি সর্ব্বক্ষণ,
সেই শিব দিন মোরে পাপনাশী ধন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ

চরকীয় নীতি।

ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ—নিয়ম-ভঙ্গ করিও না, যদি পিতৃ-পিতামহাদি-কৃত কোনও শুভোদ্দেশ্যমূলক প্রথা গৃহমধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহা সহসা লঙ্ঘন করিও না, অথবা যদি তুমি নিজে বহুবিচার পূর্ব্বক কোনও নিত্য-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া থাক, তবে তৎসম্বন্ধেও বিস্মৃত বা অনভিনিবিষ্ট হইও না।

ন বৃদ্ধান্ ন গুরূন্ ন গণান্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ ন চাতিব্রুয়াৎ—বৃদ্ধদিগের বিষয়ে, গুরুদিগের সম্বন্ধে, কোনও সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এবং রাজার সম্বন্ধে কোনও নিন্দাবাণী মুখে আনিও না, অথবা তাঁহাদের অভ্যাস বা ক্রিয়া কলাপের অতিরঞ্জিত বর্ণনাও করিও না।

নাভৃতভৃত্যো না বিশ্রব্ধস্বজনো নৈকঃসুখী স্যাৎ—রক্ষিত ভৃত্যের পালনে অমনোযোগ, স্বজন সমূহের প্রতি অবিশ্বাস, এবং পর-সুখ-দুঃখে অন্ধ হইয়া কেবল আত্মসুখ-চেষ্টা কদাপি করিও না।

ন গবাং দণ্ড মুদ্যাচ্ছেৎ—গাভীর প্রতি কখনও দণ্ড উত্তোলিত করিও না।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কার্পাসী।

বাঙ্গালা নাম—কাপাস; হিন্দী—কপাস, রুইকে পেড়; ইংরাজী—Cotton Plant; সংস্কৃত পর্য্যায়—কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে। সংস্কৃত নাম—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা। অন্যনাম—বদরা, পটদ, সূত্রপুষ্পা, চব্যা, তুলা, গুড়, মরুদ্ভবা, পিচু, ছাদন।

কাপাসের গাছ মানুষের দেড় বা দুই গুণ উচ্চ হয়। পাতা প্রায় স্থলপদ্ম পাতার মত, ঝোঁপা ঝোঁপা ফল গুলি ফাটিয়া তুলা বাহির হয়, তাহার মধ্যে বড় এলাচের দানা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় কাল কাল বীজ থাকে। ফুল শাদা হয়। কিন্তু আর এক প্রকারের কাপাস আছে তাহার ফুল লাল, তাহাকে "রক্ত কাপাস" বলে। ভারতবর্ষে কাপাস বৃক্ষ বহুল পরিমাণে জন্মে।

শ্বেত কাপাসের গুণ।

কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশিনী।
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু॥
তৎকর্ণ পীড়কা নাদ পূয়স্রাব বিনাশনম্॥

শ্বেত কার্পাস লঘু, ঈষদুষ্ণ, মধুর রস, বায়ুনাশক। ইহার বীজ স্তন্যপ্রদ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, কফকর ও গুরু। ইহা কর্ণ-পীড়কা, কর্ণনাদ, ও কর্ণের পূযস্রাব বিনাশক।

রক্তকাপাসের গুণ।

রক্তকার্পাসিকা স্বাদ্বী স্তন্যবৃদ্ধিকরী তথা।
কিঞ্চিদুষ্ণা বলকরী কষায়া চ লঘুঃ স্মৃতা॥
কফপিত্ত তৃষাদাহ ভ্রম শ্রম বমী হরা।
মূর্চ্ছাবিনাশিনী শীতা প্রোক্তা গুণ বিশারদৈঃ॥
তৎপলাশ সমীরঘ্নং রক্তকৃৎ মূত্রবর্দ্ধনম্॥

রক্তকার্পাস স্বাদু, কষায় রস, স্তন্য বৃদ্ধিকর, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, বলকর, লঘু, কফপিত্ত তৃষ্ণাদাহ ভ্রম শ্রম ও বমী নাশক। ইহা মূর্চ্ছা প্রশমক, শীতল, এবং ইহার পাতা বায়ুনাশক, (জরায়ুর) রক্ত স্রাব কারক এবং মূত্রবৃদ্ধি কর।

প্রয়োগ—কাপাসের প্রধান প্রয়োগ বস্ত্রাদি নির্ম্মাণের উপকরণ

সম্বন্ধীয়। বস্ত্র বয়ন জন্য এপর্য্যন্ত যতপ্রকার সূত্রপ্রদ বৃক্ষ বা প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কার্পাসকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ইহার বস্ত্র নাতি শীতোষ্ণ, সুখস্পর্শ, এবং ভারতবাসীর পক্ষে শীত-গ্রীষ্মে দেহের সমান উপকারী।

কাপাসের বীজ বাতরোগের স্বেদ জন্য ব্যবহৃত হয়। শঙ্কর স্বেদ নামে শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট স্বেদ আছে তাহা এই—

কার্পাসাস্থি কুলত্থিকা তিলযবৈরেরণ্ড মূলাতসী।
বর্ষাভূ শণবীজ কাঞ্জিক যুতৈ রেকীকৃতৈ বা পৃথক্।

কাপাসবীজ, কুলথ, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা, পুনর্ণবা, ও শনবীজ একত্র কাঁজিসহ বাটিয়া পোট্টলী করতঃ অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিলে নানাস্থানের বাতব্যথা দূর হয়।

কোনও স্থান ফুলিলে ও ব্যথা হইলে কাপাসবীজ চূনের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। কর্ণমধ্যে ব্রণ হইয়া পুঁজ নিঃসৃত হইলে কাপাস-বীজ-সিদ্ধ সর্ষপ তৈল কাণে দিতে হয়।

স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ কম হইলে কাপাস পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবার নিয়ম আছে।

সংস্কৃতে যে "রক্ত কার্পাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সম্ভবতঃ আজকালকার "ওলট কম্বল"! ওলট কম্বলের গুণ জানিতে বোধ হয় আর কাহারও বাকী নাই। ইহার মূল বা পত্রের রস বাঁধক রোগের বিশেষ উপকারী। অনেকে বলেন রজঃকৃচ্ছ্র ও বাধক ব্যথার পক্ষে এমন ঔষধ আর নাই। রক্ত কার্পাসের গুণবর্ণক শ্লোকটির শেষ পংক্তিতে যে "রক্তকৃৎ" বিশেষণটী রহিয়াছে তাহাদ্বারাই এই প্রসিদ্ধ গুণের আভাস পাওয়া যায়। সচরাচর বাধক রোগে শুধু ওলট কম্বলের শিকড় (আন্দাজ ৵০ আনা বা ৶০ আনা পরিমাণ) ২৷০ টা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইবার প্রথা আছে।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাস স্বকৃত সংগ্রহে এই উৎকৃষ্ট যোগটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কন্দং রক্তোৎপলস্থাথ রক্ত কার্পাস মূলকম্।
করবীরস্য মূলানি তথা রক্তোড্র মূলকম্
বকুলস্য তথা মূলং গন্ধ মাতৃক জীরকৌ

রক্ত চন্দনকং চৈব সমভাগঞ্চ কারয়েৎ
তণ্ডুলোদক সংপিষ্টং যোনিরোগ হরং পরম্।

অর্থাৎ রক্তোৎপলের মূল্য, লালকাপাসের মূল, করবীর মূল, লাল জবা বৃক্ষের মূল, বকুলমূল, গন্ধবোল, জীরা ও রক্তচন্দন এই সমুদায়ের চূর্ণ তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে যোনিশূল, কুক্ষিশূল প্রভৃতি নানারূপ বাধক অপসৃত হয়।

কাপাসের তুলা পোড়াইয়া তাহা আহত স্থানে লাগাইলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়, ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

ঘৃতসংযুক্ত কাপাসের তুলা দগ্ধ ক্ষতাদিতে লাগাইয়া রাখিলে বাহ্যবায়ুর সংস্পর্শ স্থগিত ও তৎস্থানের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষিত হওয়ায় বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়।

কাল-কাসুন্দে।

বাঙ্গালা—ঐ; ইংরাজী—Casia Sofora. সংস্কৃত—কাসমর্দ্দ, কালস্কন্ধ। ইহা একপ্রাকার গুল্ম, ২।৩ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, পাতা প্রায় মনুষ্যচক্ষুর ন্যায়। লম্বা লম্বা সরু শিমের ন্যায় ফল হয়, তন্মধ্যে মুগের ন্যায় বীজ থাকে।

ইহার পত্র, বীজ ও মূল নানাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়। হুকার জলে লবণসহ ইহার বীজ বা মূল বাটিয়া লাগাইলে দদ্রু দূর হয়; পত্রের রস গন্ধক সহ লাগাইলে চুলকানী ও পাচড়া সারে। ইহার বীজের চূর্ণ ৩।৪ রতি মধুসহ চাটিয়া খাইলে শ্বাস-কাসে উপকার দর্শে। কোনও প্রাচীন বৈদ্য তাঁহার নিজের শ্বাস কাস রোগের জন্য এই মুষ্টিযোগ আবিষ্কার ও ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছিলেন—যথা কালকাসুন্দে বীজ চূর্ণ, ময়ূর পুচ্ছভস্ম ও হিংভস্ম একত্রে পুরাতন ঘৃতে মাড়িয়া সিদ্ধছোলাপ্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। অনুপান ঈষদুষ্ণ জল। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

চক্রদত্ত লিখিয়াছেন—কালকাসুন্দে বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক সমভাগে জলসহ বাটিয়া লেপদিলে ছুলি ও ধবল আরোগ্য হয়।

কালমেঘ।

ছোট ছোট গুল্মবিশেষ, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, পাতা কতকটা লঙ্কার পাতার মত কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু; এই গাছের ডাল পাতা মূল সমস্তই অত্যন্ত তীব্র তিক্তাস্বাদযুক্ত।

হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কল্পনাথ বলে। সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত ও যবতিক্ত। চরকাদি পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। ভৈষজ্য-রত্নাবলিতে ইহার প্রয়োগ আছে।

কালমেঘ পিত্তনাশক, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃদের উপকারী; জীর্ণজ্বরনাশক অগ্নিকর ও বলকর। রক্তামাশয় রোগেও উপকার করে। আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা উক্ত রোগগুলিতে কালমেঘের উপকারিতা দেখিয়া ইহার আরক বাহির করিয়া ব্যবহার করিতেছেন।

শিশুদের যকৃদ্‌রোগে কালমেঘের শক্তি অন্যান্য তিক্ত উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গীয় প্রাচীন গৃহিণীরা কালমেঘের গুণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই তাঁহারা সদ্যোজাত বা অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে কালমেঘ ঘটিত একপ্রকার বটী খাওয়াইয়া থাকেন। এই বটীকে আলুই বা আলোই বলে। ইহাতে কালমেঘের পাতা ছাড়া যোয়ান্ লবঙ্গ জীরা বড় এলাচ ও দারুচিনি থাকে। বড়ী মটর প্রমাণ করিতে হয়। এই বড়ী শিশুদিগকে ভাল অবস্থায় মধ্যে মধ্যে খাওয়াইলে তাহাদিগের জ্বর আমাশয় কাস সর্দ্দি বমী ও জ্বর হইতে পারে না। অথবা ঐ সব রোগে সেবন করাইলেও তাহা দূরীভূত হয়। আজকাল যে এত যকৃৎ-দোষ শিশুদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহার অন্যতম কারণ নবীন গৃহ-বধূদিগের এই আলুই সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

ভৈষজ্যরত্নধৃত গুড়ূচ্যাদি চূর্ণের উপকরণে কালমেঘ আছে—

গুড়ূচ্যতিবিষা শুণ্ঠী ভূনিম্বো যবতিক্তকম্।
মুস্তং কণা যবক্ষারঃ কাসীসং ভ্রমরাতিথিঃ
যকৃৎ প্লীহ পাণ্ডুরোগ মগ্নিমান্দ্য মরোচকং।
জ্বর মষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, কালমেঘ, মুথা, পিপ্পলী, যবক্ষার, হীরাকস, ও চাঁপার ছাল, সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রয়িতব্য। মাত্রা ১—২ মাষা। ইহাতে যকৃৎ প্লীহা পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, ও অষ্টবিধ জ্বর দূরীভূত হয়।

কাবাবচিনি।

এই জিনিস্টী চরকাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। জাবা ও মলক্কাদ্বীপে জন্মে। ইহা প্রথমে ইউনানী চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। এক্ষণে ইহা এত বহুলরূপে কবিরাজসম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে যে ইহা এস্থলে বিলক্ষণ উল্লেখ-যোগ্য। আধুনিক দ্রব্যগুণ গ্রন্থে ইহার—"সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং" এই দুটী সংস্কৃত নাম কল্পিত হইয়াছে, ইতঃ পর এই নামই ভবিষ্যতে নব-রচিত চিকিৎসাগ্রন্থে প্রচলিত হইবে।

বাঙ্গালা নাম—কাবাবচিনি, হিন্দী-শীতলচিনি বা শীতল মিরিচ; ইংরাজী—Cubeba.

> সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বায়ুশমনং মতম্।
> শ্লেষ্মোৎসারণ মাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা।
> ঔপসর্গিক মেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্।
> শ্বেত প্রদর মর্শাংসিকৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ॥ সংগ্রহ।

ইহা বায়ুপ্রশমক, কফনিঃসারক, আগ্নেয়, মূত্রবৃদ্ধিকর। বিষাক্তমেহ শুক্রমেহ শ্বেতপ্রদর অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক। মাত্রা ৴০আনা হইতে ৵০ আনা।

প্রয়োগ—ইহা ইংরাজীমতে একটী "মৃদু-উত্তেজক বস্তু", এই উত্তেজন ক্রিয়া প্রধানতঃ মূত্রযন্ত্রে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য ইহা সেবনে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। ইহার এই প্রভাব থাকায় নূতন বিষাক্ত মেহে ইহার প্রভূত ক্ষমতা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা এতদ্রোগ প্রশমন সম্বন্ধে ইহার প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন করেন। তাঁহারা ইহার চূর্ণ অপেক্ষা ইহা হইতে নিঃসারিত তৈলই অধিক প্রয়োগ করেন। কখন কখন তাঁহারা অধিকতর ফলাশায় ইহার সহিত চন্দন তৈল মিশাইয়া থাকেন। কবিরাজগণ কাবাবচিনির সহিত

বেণামূল, গোক্ষুরবীজ, বাবলাছাল প্রভৃতি সংযোগ করিয়া পাচনরূপে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

কাবাবচিনির গুঁড়া মেহাধিকারোক্ত বঙ্গেশ্বরের একটী প্রধান অনুপান। কাবাবচিনির গুঁড়ার সহিত কাঁচা হলুদের রস সংযুক্ত হইলে উক্তমেহে অধিকাংশস্থলে অতীব আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইলেও ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

কাবাবচিনি স্বপ্নদোষের একটী মহৌষধ। ৵০ আনা মাত্রায় রাত্রে শয়নকালে কর্পূরের জলসহ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; উহাতে কিঞ্চিৎ চূণের জল সংযুক্ত হইলে আরো ভাল হয়। কাবাবচিনি শুষ্ককাসরোগে উপকারী। মিশ্রীসংযোগে মুখে রাখিলে উৎকাসি নিবারিত হয়, কখন কখন ইহাদ্বারা হাঁপানিও উপশমিত হয়।

কাবাবচিনি পানের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়াথাকে, কিন্তু অধিক দিলে বিস্বাদ হইয়া যায়।

কামিনী।

ইহা এক প্রকার ফুলের গাছ; অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন। ফুল গুলি অতীব সুগন্ধ, ছোট ও শাদা, হাত দিলে ঝরিয়া পড়ে। পাতাগুলি ছোট ছোট, ঈষৎ লম্বা। গাছ মানুষের দেড় দুইগুণ উচ্চ হয়, চারিদিকে ইহার ডাল গুলি বিস্তৃত হইয়া ঝোপ্ হইয়া উঠে। উদ্যানের, বিশেষতঃ, প্রবেশ পথের শোভার জন্য ইহার বড় আদর। ইহার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয় না। তথাপি বহুকাল প্রচলিত লৌকিক ব্যবহার দ্বারা ইহার যে গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এস্থলে উল্লেখ্য।

এই গাছ জাতী-যুথী ফুলের গাছের সমগুণ। ইহার পত্র কটুতিক্তরস, ও ক্ষতঘ্ন। জাতী পত্রের ন্যায় ইহারও পত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথের সহিত মুখ ধুইলে মুখের ঘা ভাল হয়। অনেক সময়ে জাতী পত্রের অপেক্ষাও কামিনী পাতার এবিষয়ে অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। স্ত্রীবা পুরুষের গণোরিয়া রোগে মূত্র নালীর মধ্যে প্রদাহ হইলে ক্বাথের পিচকারী উপকারী।

পাতার ক্বাথে অল্প ফট্‌কারী মিশাইয়া পিচকারী করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কামিনীফুল ঘৃত সৈন্ধব সংযোগে ভাজিয়া খাইলে কাসরোগীর উপকার হয়।

কামিনীর ডাল কুঁদিয়া উত্তম মালা প্রস্তুত হয়। তাহা ঔষধ সম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহৃত হয়, ইহার ডালের অতি উৎকৃষ্ট লাঠী প্রস্তুত হয় তাহা হাতে করিয়া বেড়াইলে নাকি সাপের ভয় থাকে না।

কালাদানা।

ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষের বীজ, ইংরাজীতে "ফার্ব্বাইটিস্ নীল" বলে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে জন্মে। বীজগুলি কোণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র। গুঁড়া করিলে ধূসরবর্ণ হয়। মুখে দিলে কটু ও ঈষৎ মিষ্ট আস্বাদ। অনেক-ক্ষণ মুখে রাখিলে মুখমধ্যে চিন্ চিন্ করে। ইহার চূর্ণ জলে গুলিলে একটু আঠা আঠা হয়; সুতরাং উত্তমরূপে জলে গুলিয়া না দিলে বমি হইয়া যাইতে পারে। কালাদানাচূর্ণ প্রবল-রেচক, যোগ্যমাত্রায় সেবন করিলে দাস্ত হইতেই হইবে। এবং বিরেচন ক্রিয়া ১।২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ হয়। ইহা সোণামুখী অপেক্ষা একটু উষ্ণবীর্য্য। সুতরাং মিশ্রী মউরী প্রভৃতি বায়ুনাশক উপ-করণের সহিত দেওয়া উচিত। কালাদানার মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত। ইহা বণিকের দোকানে সুলভমূল্যে বিক্রীত হয়। হাকিমেরা এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। যদিও আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ নাই, তথাপি ইহার গুণ দেখিয়া কবিরাজের ইহা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা সকল্পিত বিরেচক চূর্ণ বা বটীতে এবং সালসার উপকরণ মধ্যে ইহা দিয়া থাকেন।

কাশ, কুশ।

বাঙ্গালায় প্রথমটীকে কেশে বলে, ইহা এক প্রকার ঘাস জাতীয় লম্বা গাছ, ইহাতে পাড়া গাঁয়ে ঘর ছাওয়া হইয়া থাকে। কুশ অনেকেই দেখি-য়াছেন, শ্রাদ্ধাদিতে কুশ পূজোপকরণ মধ্যে আবশ্যক হয়। শুষ্কাবস্থায় অবশ্য

সকলেই ইহা দেখিয়াছেন—যেহেতু ইহা দ্বারাই কুশাসন প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কুশ ও কাশ প্রায় এক জাতীয়, কিন্তু কুশের পাতা অপেক্ষাকৃত একটু সরু। উভয়েরই পাতায় অত্যন্ত ধার আছে।

কাসের সংস্কৃত নাম—কাশঃ কাশেক্ষুঃকৃদ্দিষ্ট সস্থাদ্ ইক্ষুরস স্তথা ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধাচ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ।—

কাশঃ স্যান্ মধুর স্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র ক্ষয়পিত্তজ রোগজিৎ॥

কাশ মধুর তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, সারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তস্রাব ক্ষয় ও পিত্তজরোগ নাশক।

কুশের সংস্কৃত নাম—কুশো দর্ভস্তথা বর্হি স্বচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।

কুশস্তু স্যাৎ ত্রিদোষঘ্নঃ মধুরঃ তুবরো হিমঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী তৃষ্ণা বস্তিরুক্ প্রদারাস্র জিৎ।

কুশ মধুর কষায়, হিম, ত্রিদোষঘ্ন, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরুক্ (তলপেটব্যথা) প্রদর ও রক্তপিত্ত নাশক।

প্রয়োগ—উভয়েরই প্রধান শক্তি মূত্রনিঃসারণ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ। প্রস্রাবের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকিলে কুশ ও কাশ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের যদি এই দুর্ঘটনা হয়, তবে তাহাও ইহা দ্বারা নিবারণ হইয়া থাকে। কুশ ও কাশের মধ্যে পিত্তনাশক শক্তি ও মূত্রকারক শক্তি একত্র থাকায় ইহাদের দ্বারা প্রস্রাবকালীন জ্বালা দূরীভূত হয়।

ইহাদের শক্তি মূত্রযন্ত্রের উপরে সমধিক, এই যন্ত্রের বিকৃতি জন্য রক্তপ্রস্রাব হইলে তাহা সত্বর নিবারিত হয়, উর্দ্ধগ রক্ত পিত্তাদিতে ইহার কোনও শক্তি দৃষ্ট হয় না। কুশ ও কাশ তৃণ পঞ্চমূলের দুইটী প্রধান উপকরণ। তৃণ পঞ্চমূল যথা—কাশ, কুশ, শর, উলু, কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল। এই তৃণপঞ্চমূল নূতন বিষাক্ত মেহে বা অন্যবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। যন্ত্রণার সহিত অল্প অল্প প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। শাস্ত্রোক্ত কুশাবলেহ, কুশাদ্য ঘৃতে, তৃণপঞ্চমূলাদ্যঘৃত ও কুশাদ্য তৈলে কুশ-কাশ আবশ্যক হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন

গত ১৩০৬ সালের জৈষ্ঠ মাসে "ঋষিপত্রিকার" ১ম বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; ১৩০৬ সালের আষাঢ় হইতে ২য় বৎসর আরম্ভ হইয়া, বর্ত্তমান চৈত্র মাসে "ঋষির" ১০ম মাস চলিতেছে; অদ্যাপি যাঁহারা ২য় বৎসরের মূল্য দেন নাই, তাঁহরা কৃপাপূর্ব্বক ঋষির বার্ষিক ১৲ টাকা পাঠাইয়া উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন।

অনেক গ্রাহক ঋষির সৎকথা আরও অধিক মাত্রায় শুনিবার জন্য স্ব স্ব ঔৎসুক্য আমাদিগকে জ্ঞাপন করায়, সম্ভবতঃ তৃতীয় বর্ষ হইতে ঋষির কলেবর বৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

PRINTED BY S. C. CHAKRABORTI, AT THE KALIKA PRESS,
17, Nunda Coomar Chowdhury's 2nd Lane,
CALCUTTA.

ঔষধ-বিক্রেতা!　　　　ঔষধ-বিক্রেতা!

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী।

প্রধান ঔষধালয়,—১০১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—শাখা সকল—

১। ২২৬ নং হ্যারিসন রোড, বড়বাজার। ২। ২ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, লালবাজার। ৩। ২৯৫ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার।

মফস্বল—[১] বাঁকিপুর, [ক] চৌহাট্টা, [খ] বাখরগঞ্জ। [২] চক্, পাটনা সিটি। [৩] হোলী দরওয়াজা, মথুরা-ধাম।

আমাদের ঔষধালয় কলিকাতার এক জন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সত্বর সদুত্তর প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্ব প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক ও চিকিৎসোপযোগী সমস্ত যন্ত্রাদি যথামূল্যে আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

পত্র লিখিলেই ইংরাজী বাঙ্গালা বা উর্দ্দু ক্যাটলগ পাঠান যায়।

আয়ুর্ব্বেদ-সোপান।

দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা, ভি-পি তে ১৶০।

(পরিবর্ত্তিত,—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। দ্রব্যগুণ, নাড়ী পরীক্ষা, ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুত-বিধি এবং অনেক নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আকারে পূর্ব্বাপেক্ষা ঠিক্ দেড় গুণ বাড়িয়াছে।)

এই পুস্তকের দ্বারা অতি শীঘ্র কবিরাজী শিখিতে ও ব্যবসায় করিতে পারা যাইবে। ইহা দ্বারা গৃহস্থ অনায়াসে অতি সামান্য ব্যয়ে নিজের রোগ ও নিজ পরিবারের রোগ নিজেই চিকিৎসা করিতে পারিবেন—কথায় কথায় আর ডাক্তার-কবিরাজকে ডাকিতে হইবে না। আয়ুর্ব্বেদের দুর্ব্বোধ্য নিগূঢ় কথাগুলি এত সরল, সুস্পষ্ট, সহজ করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত লেখেন নাই। যিনি চরক-সুশ্রুতাদি বড় বড় গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারও এই পুস্তক অবশ্যই পড়া উচিত, যেহেতু শাস্ত্রোক্ত ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই লেখা নাই, এবং ইতিপূর্ব্বে তাহা কোন চিকিৎসকই প্রকাশ করেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

২য় বর্ষ, ১শ ও ১২শ সংখ্যা। ১৯০০, এপ্রেল, মে। ১৩০৭, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲।
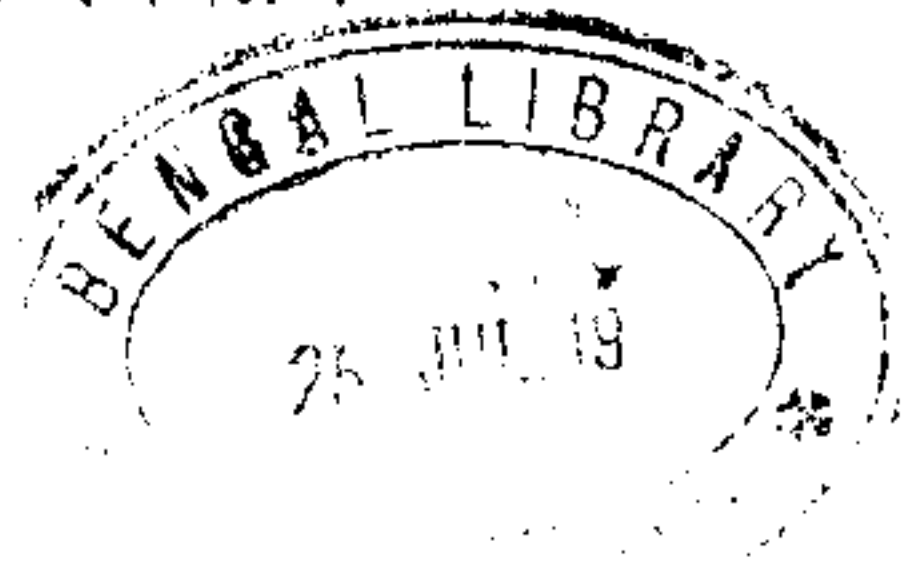
ঋষি

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট উপাধি ও সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—পাপের সৃষ্টি ও রোগ, দময়ন্তী, চরকীয় নীতি, স্থূল ও কৃশ, দ্রব্যগুণ বিচার, দুর্গা-স্তোত্রম, দুর্জ্জন-নিন্দা।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। } { ১৩০৭, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

পাপের সৃষ্টি ও রোগ।

"আদিকালে হ্যদিতিসুতসমৌজসোঽতিবিমলবিপুলপ্রভাবাঃ প্রত্যক্ষ দেব-দেবর্ষি ধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ শৈলেন্দ্রসারসংহতস্থিরশরীরাঃ প্রসন্নবদর্ণেন্দ্রিয়াঃ পবন সমবলজব পরাক্রমা শ্চারুস্ফি চো হ ভিরূপপ্রমাণাকৃতি প্রসাদো-পচয়বন্তঃ সত্যার্জ্জবানৃশংস্যদানদম নিয়ম তপ উপবাস ব্রহ্মচর্য্যব্রত পর ব্যপ-গত ভয়রাগ দ্বেষমোহ লোভক্রোধ-শোকমান রোগ নিদ্রাতন্দ্রা শ্রম ক্লমালস্য পরিগ্রহাশ্চ পুরুষা বভূবু রমিতায়ুষঃ।"

যখন এই পৃথিবী স্রষ্টার হস্ত হইতে অচির-নিঃসৃত ও অল্পসংখ্যকমাত্র জীবসমূহের বাসভূমি ছিল—যখন ইহার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণই নবীন ও পরিমেয় ছিল, তৎসময়ের মনুষ্যগণের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগকে আর মানব-নাম-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। যেমন হস্তীর নিকটে ছুছুন্দর, ময়ূরের সান্নিধ্যে মশক, অশ্বত্থের সমীপে দূর্ব্বা-গুচ্ছ এবং জ্যোতির্ময়তা দেবতার সন্নিধানে পিশাচ-পুত্তলী, সেই আদিকালীন মনুষ্যবর্গের তুলনায় আমরাও যে অতীব হেয় ও জঘন্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাকালে অসুরের ন্যায় তেজঃশালী বিমল-বিপুল-প্রভাব-সম্পন্ন, প্রত্যক্ষ-দেব দেবর্ষিতুল্য, ধর্ম্মকর্ম্ম ও যজ্ঞবিধির অনুষ্ঠায়ক, পর্ব্বতের ন্যায় সংহত সারবান্ ও সুদৃঢ়-কায়-বিশিষ্ট, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও চক্ষুঃ কর্ণাদির মাধুর্য্য এবং প্রসন্নতাময়, প্রভঞ্জনতুল্য-বল বেগ-পরাক্রমী, মনোজ্ঞ নিতম্ব, যথোপযুক্ত-প্রমাণা-কৃতি সৌষ্ঠব, ও ঔন্নত্য-সমন্বিত, সত্য সরলতা অনৈষ্ঠুর্য্য, দান দম নিয়ম তপস্যা উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরায়ণ, ভয় রাগ দ্বেষ মোহ লোভ ক্রোধ

শোক আত্মাভিমান, রোগ, নিদ্রালুতা, তন্দ্রা, শ্রম-ক্লান্তি, আলস্য ও পরদ্রব্য-স্পৃহা বিবর্জ্জিত পুরুষগণ ছিলেন, এবং তাঁহাদের আয়ুঃও অপরিমিত ছিল।

"তেষা মুদার সত্ত্ব গুণ-কর্ম্মণা মচিন্ত্যরসবীর্য্যবিপাক প্রভাব গুণসমুদিতানি প্রাদুর্বভূবুঃ শস্যানি, সর্ব্বগুণ সমুদিতত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং কৃতযুগস্যাদৌ। ভ্রশ্যতি চ কৃতযুগে কেষাঞ্চি দত্যাদানাৎ সাম্পন্নিকানাং শরীর গৌরব-মাসীৎ। সত্বানাং গৌরবাৎ শ্রমঃ শ্রমাদালস্যম্ আলস্যাৎ সঞ্চয়ঃ। সঞ্চয়াৎ পরিগ্রহঃ পরিগ্রহাল্লোভঃ প্রাদুর্ভূতঃ।"

সত্যযুগের আদিতে পৃথিবী সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিল বলিয়া, সেই উদারচেতা সদ্‌গুণাধার অনিন্দ্যকর্ম্মা পুরুষগণের সমক্ষে চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যবীর্য্যময় অচিন্ত্য-বিপাক-প্রভাব-গুণশালী অজস্র শস্য সমুদায় উৎপন্ন হইত।

তৎপরে সত্যযুগের ক্রমিক অপগমে যখন ঐ সমস্ত পৃথিবীগুণ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কোনও কোনও ব্যক্তি অতিরিক্ত গ্রহণ করায় ও তজ্জন্য সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অবস্থায় উপনীত হওয়ায়, ক্রমে তাহাদের দেহের গুরুত্ব আসিয়া পড়িল, তখন শরীরের গুরুতা হেতু শ্রান্তি বোধ, শ্রান্তি হইতে আলস্য (শ্রমবৈমুখ্য) আলস্য হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়েচ্ছা ও সঞ্চয় হইতে পরিগ্রহ (যথাপ্রাপ্ত যথাদৃষ্ট বস্তুর গ্রহণোদ্যম) এবং পরিগ্রহ হইতে তাহাদিগের মনে লোভের আবির্ভাব হইতে লাগিল। তদনন্তর সত্যযুগ অপসৃত হইলে, ত্রেতার সমাগমে লোভ হইতে প্রতিবেশীর দ্রব্যজাত বলাৎকার দ্বারা গ্রহণের প্রবৃত্তি উন্মেষিত ও পরস্ব-সম্বন্ধে "এ দ্রব্য আমার" ইত্যাদিরূপ মিথ্যা ভাষণ আরব্ধ হইল। মিথ্যাকথন অভ্যস্ত হওয়ায় কাম জাগিয়া উঠিল, কামের ব্যাঘাতে ক্রোধ ও আত্মাভিমান, তৎপরে দ্বেষ, দ্বেষের উদ্রেকে হৃদয়ের কোমলতা দূরে গিয়া তৎস্থানে নৈষ্ঠুর্য্য ও পারুষ্যের অধিষ্ঠান সুতরাং বিরোধিপক্ষের প্রহারাদি-নির্যাতনের ইচ্ছা উপনীত হইল। প্রহারাদির বিভীষিকার সহিত-ভয়, পরিতাপ, শোক, চিত্তোদ্বেগ প্রভৃতি আসিয়া জুটিল।

"তত স্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদোন্তর্ধান মগমৎ। তস্যান্তর্ধানাৎ পৃথিব্যাদীনাং গুণপাদ-প্রণাশো হভূৎ। তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শস্যানাং স্নেহবৈমল্য রসবীর্য্য বিপাক প্রভাব গুণপাদ ভ্রংশঃ।"

এইরূপে, সত্যযুগ-সুলভ সেই পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পাদধর্ম্মের এক পাদ অর্থাৎ

চতুর্থাংশ ত্রেতাযুগে অন্তর্হিত হইল। ধর্ম্মের একপাদ বিলুপ্ত হইলে পর পৃথিবী-জল-বায়ু প্রভৃতির স্ব স্বগুণের একপাদ বিনষ্ট হইল। পৃথিব্যাদির স্বাভাবিকী শক্তির একপাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় শস্যসমূহের স্নেহ (পোষক শক্তি) নির্ম্মলতা, মধুরতা, বীর্য্যবত্তা, বিপাক, প্রভাব ও রোগনাশকত্বাদি গুণের একপাদ তিরোভূত হইল।

"তত স্তানি প্রজাশরীরাণি হীন গুণপাদৈ র্হীয়মান গুণৈ শ্চাহার বিহারৈঃ যথাপূর্ব্বম্ উপষ্টভ্যমানানি অগ্নিমারুত পরীতানি প্রাগ্ ব্যাধিভি র্জ্বরাদিভি রাক্রান্তানি, অতঃ প্রাণিনো হ্রাস মবাপুরায়ুষঃ ক্রমশ ইতি।"

তদনন্তর সেই গুণপাদহীন ও ক্ষীয়মান শক্তি আহারবিহারের দ্বারা যথাক্রমে পোষিত হওয়ায় মানব গণের শরীর অগ্নিবায়ু-বহুল হইয়া প্রারম্ভে জ্বরাদি রোগ গ্রস্ত হইল। অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের যে দেহ কাম ক্রোধাদির দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে উত্তেজিত ও তাপান্বিত ছিল, সেই দেহে স্নেহ-বীর্য্য-মাধুর্য্যহীন শস্যাদি ঘটিত অপকৃষ্ট অন্ন প্রবেশ পূর্ব্বক দৈহিক অগ্নি-বায়ু-ধর্ম্মকে (বাত-পিত্তকে) বর্দ্ধিত করিল—

অতএব মানবদেহ সর্ব্বপ্রথম উত্তাপাত্মক জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হইল। সেই কারণে-দেহে জ্বর হইতে শাখা-প্রশাখাক্রমে অন্যান্য রোগের আবির্ভাব, তদ্ধেতু পুরুষগণের আয়ু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এইরূপে সত্যযুগের ধর্ম্মরাজত্ব, নীরোগতা ও দীর্ঘজীবিত্ব ক্রমে প্রত্যেক পরবর্ত্তীযুগে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় বর্ত্তমান কলিযুগে আমরা মানবগণের এই লোমহর্ষণ পাপ-প্রবৃত্তি, রোগ বাহুল্য ও অল্পায়ুস্ক দেখিতে পাইতেছি।

দময়ন্তী।

ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া সতীদিগের মধ্যে দময়ন্তীর স্থান অতি উচ্চে। আজ তাঁহার পবিত্র চরিত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পুরাতন বিষয় বলিয়া, ভরসা করি পাঠিকাগণ বিরক্ত হইবেন না।

প্রসিদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রকার ভগবান মনু সাধ্বী নারীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—

"পতিং যা নাভি চরতি মনোবাক্ দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃ লোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতিচোচ্যতে॥

যে রমণী কায় মন বাক্যেও ব্যভিচারিণী না হয়েন্ তিনি পতি-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পতিব্রতার লক্ষণ।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা নারী সাচ জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

যে নারী স্বামী দুঃখিত হইলে দুঃখিতা, সুখে হৃষ্টা, পতি দেশান্তর গমন করিলে মলিনা ও কৃশা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুগমন করেন তাঁহাকে পতিব্রতা কহে।

সাধ্বী নারী দেশের গৌরব, সমাজের ভূষণ, প্রত্যেক নর নারীর উপাস্য দেবতা। দেবতার পূজা যেমন কখনও পুরাতন হয়না তদ্রূপ সতীর চরিত্রালোচনাও কখনও পুরাতন হয়না। সেই বিশ্বাস ও ভরসায় সেই অতি প্রাচীন পবিত্র দময়ন্তীর আখ্যান পাঠিকা ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম।

দময়ন্তী অতি প্রবল পরাক্রান্ত সমৃদ্ধ বিদর্ভপতি মহারাজ ভীমের এক মাত্র দুহিতা। সাধারণতঃ রাজকন্যা মাত্রেই যেরূপ আদরের সোহাগের হয়, দময়ন্তী তদপেক্ষা অধিক স্নেহ যত্নের ধন ছিলেন। রাজা ভীম বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও নিঃসন্তান ছিলেন, পরে দমন নামে এক পরম তেজস্বী ব্রহ্মর্ষির আরাধনা করিয়া দময়ন্তী নাম্নি কন্যারত্ন ও দম, দান্ত, দমন নামে তিনটি পুত্র লাভ করেন। দময়ন্তী যেরূপ সাধের ও আদরের মেয়ে ছিলেন, রূপে গুণেও সেইরূপ অতুলনীয়া ছিলেন। "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা দময়ন্তীর প্রতিই সুপ্রযুক্ত হইবার যোগ্য। ফলতঃ তাঁহার রূপ গুণ ও সৌভাগ্যের খ্যাতি তৎকালে সমগ্র ধরণী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় নিষধ দেশে বীরসেন রাজতনয় মহারাজ নল রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি রূপে গুণে ও শূরত্বে তৎকালিক নৃপতিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। অধিক কি দেবতাদিগের মধ্যে শচীনাথ ইন্দ্র যেরূপ, মর্ত্তে রাজাদিগের মধ্যে নল সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন; রাজা নল ও রাজকন্যা দময়ন্তী উভয়ে উভয়ের যোগ্য ছিলেন।

কালে তাঁহাদের উভয়ের রূপ গুণাদির বিবরণ উভয়ে অবগত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

একদা মহারাজ নল তাঁহার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় এক সুবর্ণ-পক্ষ হংস অন্তরীক্ষ হইতে তাঁহার সন্মুখে নিপতিত হইল। হংসের সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত অসাধারণ রূপ দেখিয়া নল তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। হংস প্রাণভয়ে নৃপতিকে বলিল, "মহারাজ আমাকে মারিবেন না, আমি দময়ন্তীর নিকট আপনার বিষয় এরূপ ভাবে বলিব যে, তিনি আপনাকে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেননা।" এরূপ কথায় কাহার না মন গলিয়া যায়? মহারাজ হংসকে ছাড়িয়া দিলেন। হংস কৃতঘ্ন নহে, সে সদল বলে দময়ন্তীর নিকটে গিয়া যে উপবনে তিনি সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন সেই খানে গিয়া পড়িল। কন্যাগণ হিরণ্ময় পক্ষযুক্ত চিত্তোন্মাদক হংস সকল দেখিয়া ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, এক একজন এক একটি হংসের পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন। দময়ন্তী যে হংসের পশ্চাদ্ধাবিতা হইয়াছিলেন; সে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল "নিষধ দেশে নল নামে এক অতি অপরূপ রূপগুণ সম্পন্ন রাজপুত্র আছেন, অধিক কি তাঁহাকে মূর্ত্তিমান কন্দর্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুমি নিজে যেমন রূপ গুণবতী রমণীরত্ন রাজা নলও সেইরূপ রাজকুলরত্ন। তোমাদের উভয়ের সংযোগই আমাদের প্রার্থনীয়।" দময়ন্তী হংসের এইকথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মহারাজ নলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দ্বিগুণতর উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

এদিকে কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া রাজা ভীম দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিলেন। নানা বিদেশীয় নরপতি বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া বিদর্ভে আগমন করিলেন। নিষধাধিপতি নলও আগমন করিলেন।

দময়ন্তীর রূপে গুণে মোহিত হইয়া, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ চারি দিক-পালও তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া বিদর্ভে আগমন করিলেন। স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত যাঁহার রূপে মুগ্ধ, গুণে আকৃষ্ট তিনি কিরূপ অলোক সামান্যা রূপ গুণবতী ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

আবার অলৌকিকত্ব। এইবার নলের পরীক্ষা। মানুষ বাহুবলশালী

হইলেও তাঁহাকে বীর বলেনা,সে পশুবল মাত্র। ইন্দ্রিয় ও কামনা জয়ই বলের বাস্তবিক নিদর্শন, তাহাই প্রকৃত বীরত্ব। নলের সেই পরীক্ষা হইল। ইন্দ্রাদি দিকপালগণ দময়ন্তীর চিত্ত পরীক্ষার্থ তৎসমীপে দূত প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যায় কে? অদ্বিতীয় রূপবান নলকেই তাঁহারা দৌত্যপদে বরণ করিলেন। নল ভাবিলেন "ইহা মন্দ কথা নহে, নিজে বিবাহ করিতে আসিয়া অন্যের জন্য ঘটকালি করিতে হইল, তিনি বলিলেন,—

যে কার্য্যে, অমরগণ! কৈলে আগমন।
সেই কার্য্যে চলি আমি লোক পালগণ!
দূতরূপে প্রেরণ করিতে এইজনে।
উচিত না হয় দেব ভাবি দেখ মনে।
ত্রিভূবনে এ হেন পুরুষ কোন্‌জন।
কামিনীর প্রতি কার, সঙ্কল্পিত মন॥
অন্য তরে হেন বাক্য বলিবারে পারে?
প্রভুগণ! ইথে ক্ষমা করহ আমারে।

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৺ রাজকৃষ্ণরায়ের অনুবাদ)

কিন্তু দেবতারা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলিলেন "তোমা ব্যতীত একার্য্য সমাধা করিতে পারে এমন কেহই নাই তোমাকেই যাইতে হইবে।" নল অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। দেবতাদের কৃপায় মানুষের অমানুষিক শক্তি লাভ হয় নলও দৈবানুগ্রহে লোক চক্ষুর অগোচরে রাজান্তঃপুরে দময়ন্তীর সকাশে উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তী পূর্ব্বে নলের রূপ গুণের কাহিনী অবগত ছিলেন মাত্র কখনও দেখেন নাই। এখন সম্মুখে সেই শ্রুত পূর্ব্ব অমানুষ রূপ গুণ বীর্য্য সম্পন্ন নল, দময়ন্তী সেই দেবোপম মূর্ত্তি দর্শনে কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন। নল আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক যখন তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন দময়ন্তী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সেকি! আমি যে পূর্ব্বেই আপনাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। এখন আমাকে একি কথা বলেন? আমি আপনাকেই জানি দেবতাগণ আমার মাথায় থাকুন।" তখন নৈষধরাজ বলিলেন,—

লোক পাল গণ চাহে তোমারে শোভনে!
মানুষে বাসনা তব কেন চন্দ্রাননে!

যেই লোক পাল গণ ঈশ্বর মহান্!
আমরা যাঁদের পদ রেণুর সমান।

প্রবৃত্ত হউক সেই দেবগণে মন।
দেবের অপ্রিয় করি নরের মরণ।

ত্রাণ কর তন্বঙ্গি! বরহ সুর গণে।
কেনবা দেবের ক্রোধে পড়িবে শোভনে?

দেবে লভি বিমল বসন মনোহর।
দিব্য চিত্র মাল্য, দিব্য ভূষণ নিকর।

উপভোগ কর যথা সুখে সর্ব্বক্ষণ।
মানুষী হইয়া স্বর্গে কর বিচরণ।

যেই এই অখিল অবনী সৃষ্টি করে।
গ্রাস করি পুনশ্চ যে সকল সংহরে।

দেবের ঈশ্বর সেই দেবহুতাশনে!
কোন্ নারী পতিরূপে না বরে ভুবনে?

যাঁর দণ্ড ভয়ে শুভে, সর্ব্ব প্রাণীগণ।
ধর্ম্ম অভিমুখে সতি! করয়ে গমন।

এ হেন কামিনী কেবা আছয়ে ভুবনে।
সেই ধর্ম্মরাজে পতি না বরে শমনে?

সর্ব্ব দেবেশ্বর যেই মহেন্দ্র মহান্।
ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা যেই ত্রৈলোক্য প্রধান।

দিতিজ দানব বিমর্দ্দন সে বাসবে।
কে হেন রমণী পতি না বরে এ ভবে?

যে জীবন বিনা জীব না বাঁচে কখন।
সেই জল পতি স্থিতি লয়ের কারণ।

শুনিয়া সুহৃদ্ বাক্য যদি কর মনে
নিঃশঙ্ক মানসে তবে বরহ বরুণে।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ)

নল চূড়ান্ত ঘটকালি করিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর হৃদয় টলিল না। এই খান হইতেই আমরা দময়ন্তীর পবিত্র চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

চরকীয় নীতি।

আত্মহিতং চিকীর্ষতা সর্ব্বেণ সর্ব্বং সর্ব্বদা স্মৃতিমাস্থায় সদ্বৃত্ত মনুতিষ্ঠেৎ—যিনি আত্মহিত প্রার্থনা করেন, এরূপ ব্যক্তিমাত্রই যেন নিজ স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত না হইয়া সর্ব্বদা সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করেন। বস্তুতঃ, আমি কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? কে কার? কাহার জন্য কি করিতেছি? কতদিন আমি এ পৃথিবীতে থাকিব? আমার সদসৎ কার্য্যের পরিণাম কি? ইত্যাদি-রূপ বিতর্ক যাঁহার স্মৃতিতে প্রত্যেক কার্য্যকালে যথার্থরূপে উদিত হয় তিনি অহর্নিশ কুক্রিয়ার পরিহার ও সদাচারের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে পারেন।

তদ্ধ্যনুষ্ঠানং যুগপৎ সম্পাদয়ত্যর্থ-দ্বয়ম্ আরোগ্যম্ ইন্দ্রিয়-বিজয়ঞ্চ। পূর্ব্বোক্তপ্রকার কার্য্য-নিয়ম কোনও মহানুভাবের থাকিলে, যুগপৎ তাঁহার দুটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়—আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়-বিজয়।

অতিথীনাং পূজকঃ বিনয়বুদ্ধি বিদ্যাভিজন বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধা-চার্য্যাণা মুপাসিতা স্যাৎ। অভ্যাগত জনের সৎকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, এবং যিনি বিনয়, বুদ্ধি, বিদ্যা বা পদগৌরবে তোমা অপেক্ষা উচ্চতর এরূপ ব্যক্তিগণ এবং সিদ্ধ আচার্য্যদিগের নিকট গতায়াত করিবে ও তাঁহাদের প্রসন্নতালাভে যত্নবান্ থাকিবে।

কালে হিতমিত মধুরার্থ বাদী—যখন কোনও স্থানে পাঁচজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছে তখন অকস্মাৎ অযোগ্য বাচালতা না করিয়া ঠিক্ উপযুক্ত অবসরে হিতোদ্দেশ্যমূলক, মধুরভাষান্বিত, অল্প গুটীকত সার্থক কথা বলিবে।

স্থূল ও কৃশ।

সম্বন্ধী। কবিরাজ মহাশয় আপনি বড় মোটা! মোটা মানুষ গুলো বড় বিশ্রী! উদরটী যেন রজকের বস্ত্র-পোটলী। আর প্রতিবাসী মাংস-পিণ্ডের শ্রীবৃদ্ধিতে চক্ষু দুটী যেন লজ্জায় লুক্কায়িত। গ্রীবাঞ্চল নাই বল্লেই হয়,—যেন সেটা কি সূত্রে কেমন করে কীচকহন্তা ভীমের হস্তস্পর্শ পেয়েছিল!

কবিরাজ। মর্কটপ্রবর! বল্‌ছিস্ কি? বিধাতা তোর সৃষ্টির সময়ে তোর হাড়ের কাঠামটী শেষ ক'রে মাংসের থরটা দিতে ভুলে গিয়ে-ছিলেন!—না?

তোমার কোটরে-ঢোকা চক্ষু, সারিন্দে বিনিন্দিত পেট, আর তালপাতার সেপাইএর বাড়া হাত পা গুলি তোমাকে একেবারে কন্দর্প ক'রে তুলেছে। যা হ'ক! তুমি বাপু, মেডিকেল কলেজের দিকে যেন কখনই বেড়াতে যেও না, নইলে পাছে সাহেবরা তোমাকে পলায়মান স্কেলিটন (কঙ্কাল) মনে করে টানাটানি করবে।

স। কবিরাজ মহাশয়! আমি ঠিক প্রাণের কথা বল্‌চি আমার কিন্তু মনে মনে বড় সাধ হয় যে আমি আপনার মত মোটা হই,—অন্ততঃ এ অপেক্ষা একটু মোটাও হই। আমি যে সর্ব্বদাই শার্ট্-কোট গায়ে দিয়া থাকি, সে শুধু ভদ্রতা বা বাবুগিরির জন্য নয়। আমার আল্‌গা শরীরটা লোকের সম্মুখে বাহির করিতে লজ্জা বোধ হয়। আপনার অর্দ্ধেক শরীর আমার হলেও আমি কত সুখী হতেম!

ক। আরে! পাগলা! আবার অত বাড়াবাড়ির কথা কেন? এইনা উল্‌টো উল্‌টো বলছিলে? যাহা হউক এই কথাটী ঠিক জেনো—এ জগতে যার যেটী নাই সেইটীই তার পক্ষে স্পৃহনীয় হয়। বোধ হয় রেলের বাবুরা মনে করেন, পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীদের বড় আরামের কাজ। ডাকের চাকুরে মনে ভাবেন রেল-অফিসার বড় সুখী। ছেলে মনে করে বুড়োদের কত সুখ-স্বাধীনতা! বুড়ো ভাবেন ছেলে হ'তে পাল্লে তবে কিছু সুখ হইত। আজ কালকার লোকে পরিবার মধ্যে একটী মেয়ে হলে কত ভয় পায় কিন্তু

এ বড় রহস্য—যে বাড়ীতে শুধুই ছেলে হয় সে বাটীতে কন্যার জন্য বড়ই লালসা দেখা যায়—মা ছোট ছেলেটীর বড় চুল রাখেন, দিব্য নোলক-টিপ চুড়ী পরাইয়া কন্যার সাধ কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করেন। যা'ক্ বাহিরের কথা। আমিও তোমার মত মনে মনে বড় দুঃখিত,কিরূপে দেহভার কমিবে সর্ব্বদাই ভাবি।

স। আপনিও কৃশ হইতে চান্?

ক। চাই বইকি? কিন্তু তোমার মত কৃশ হইতে চাই না। সব বিষয়েরই ভাল মন্দ আছে, মোটারও দোষগুণ আছে, কৃশ হওয়ারও দোষগুণ রহিয়াছে। দেখ, মোটা লোকে শীতকালে অনায়াসে আল্‌গা গায়ে পায়খানায় যায়, বেশ হিন্দুয়াণী রক্ষা হয়, আর কৃশব্যক্তি গায়ে সাতপর্দ্দা কাপড় না জড়াইলে ঘর থেকে এক পা বাহির হইতে পারে না। তা সত্য, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যে তার শোধ! কাহিলেরা বেশ থাকে; স্থূলকায় ব্যক্তিরা গরমের সময় হাঁসফাঁস্ করিয়া মরে।

ক। কি বিপদ্! তাই ত বল্‌ছিলাম, দুএরই দোষগুণ আছে, আমায় বল্‌তে দাও!

স। আচ্ছা চুপ করে শুন্‌ছি।

ক। মোটা লোকের আকার সম্বন্ধে তুমি যে কুৎসা গাইলে, বাস্তবিক ভেবে দেখ, তা নয়, স্থূলকায় ব্যক্তির আকৃতিতে কেমন সুন্দর এক গুরুগাম্ভীর্য্য থাকে, দেখলেই একটা বড় লোক বোধ হয়, তার কাছে সহসা কেহ চপলতা, অমান্যভাব দেখাইতে পারে না। অকস্মাৎ দর্শকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাই শাস্ত্রে বলে,—

বস্ত্রেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বিভবেন চ।
এভিঃ পঞ্চবকারৈশ্চ নরঃপ্রাপ্নোতি মান্যতাম্॥

অর্থাৎ ভাল বেশভূষা, সুগঠিত স্থূলবপুঃ, বাক্‌পটুতা, বিদ্যাবত্তা, আর বৈভব এই পঞ্চবকার দ্বারা মনুষ্য মাননীয় হয়।

স। ঠিক্ ঠিক্! সেই জন্যেই আমাদের পাড়ায় কৃষ্ণহরি বাবু (কৃশকায় নেটিব ডাক্তার) বলেন যে "আমার শরীরটা একটু মোটা হলে আমার মাসে হাজার টাকা আয় হইত!

ক। সত্যই দেহাকৃতির একটা মূল্য আছে। কথক, উকীল, মোক্তার

স্কুলমাষ্টার, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের একটু দর্শনধারী চেহারা থাকিলে বাস্তবিকই হয় ভাল।

এই সমস্ত ব্যবসায়ীদিগের অন্ততঃ অপরিচিত বা নূতন পরিচিত মক্কেলের নিকটে বেশ খাতির-যত্ন হয়।—অনেক গ্রাহক সহসা তাহার নিকট উপনীত হইতে থাকে।

স। একদিন কৃষ্ণহরি বাবু বসিয়াছিলেন, তার পাশে তার সেই মোটা কম্পাউণ্ডারটী দাঁড়িয়ে ছিল, আমি দেখিলাম একটা রোগী এসে ডাক্তার ভেবে আগে কম্পাউণ্ডার মহাশয়কেই প্রণাম করিল।

ক। দেখ্‌লে ?

স। তা'ত দেখলুম্; কিন্তু "মধুরেণ সমাপয়েৎ" রীতিটাই ত সব চেয়ে ভাল, একটী আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে বহিঃস্থৌল্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া যদি শেষে অভ্যন্তরে কৃশ দেখ্‌তে পায়, তাহ'লে তার সেই চাণক্যের "দূরতঃ শোভতে" নীতিটা কি মনে উঠে না ? তার চেয়ে প্রথমে হীনচেহারা দেখিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া পরে পরিচয়ে যদি ভিতরে পুষ্ট দেখিতে পায় তাহ'লে কেমন মজাটী হয়।

আমাদের পাড়ায় বিশ্বনাথ নামে একজন এল্ এম্ এস্ আছেন—তাঁর বড়ই কৃশ শরীর। তাঁর পঠদ্দশায় পাড়ার লোকে সর্ব্বদাই বলিত—বিশুবাবু তোমার যে চেহারা তোমার মোটেই পশার হবে না। তা শুনে বল্‌তেন— কেন ? আমাকে কি রোগীর সঙ্গে "যুদ্ধং দেহি" বল্‌তে হবে যে রোগা-শরীরে পোষাবে না ?

ক। যাক্ যাক্! চেহারার কথা ছেড়ে দাও। মোট কথা "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" অতিমাত্র কৃশস্থূলের অন্য দোষগুণও আছে; চরক বলিতেছেন— "সততং ব্যাধিতাবেতৌ অতিস্থূলকৃশৌ নরৌ" (সূত্রস্থান) অর্থাৎ অতি স্থূল ও অতিরিক্ত কৃশ ব্যক্তিদিগকে প্রায়ই কোন না কোন রোগে ভুগিতে হয়।

চরকমতে প্রধানতঃ স্থূলদেহীর দোষ এই গুলি—স্থূলব্যক্তি দেহের গুরুত্বহেতু শ্রমসাধ্য কার্য্যে অপটু হয়; তাহার অন্যান্য ধাতু বৃদ্ধি-প্রাপ্ত না হইয়া কেবল মেদোধাতুরই বৃদ্ধি হয় বলিয়া জীবনীশক্তির হ্রাস হয়। দেহের শিথিলতা ও সুকুমারত্ব হেতু কার্য্যাদিতে সমধিক উদ্যোগ

হয় না, শুক্রধাতুর বৃদ্ধি অথচ শুক্রবহা নাড়ী মেদকর্তৃক আবৃত হওয়ায় তাহার পক্ষে স্ত্রীসঙ্গম অনায়াস-সাধ্য হয় না। ধাতুসমূহের সমতা না থাকায় দেহ দুর্ব্বল ও মেদাধিক্যবশতঃ অতীব ঘর্ম্মাকুল হয় এবং শ্লেষ্মদুষ্টি হেতু দৌর্গন্ধ্যযুক্ত হইয়া থাকে। অপিচ, শ্লেষ্মসংসর্গে তাহার কফ, কাস, স্বরভঙ্গ ফোড়া, মূত্ররোগ, এবং শ্লেষ্ম দ্বারা বায়ুবহা নাড়ী সহসা অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহার সন্ন্যাস রোগ (আকস্মিক মূর্চ্ছাবিশেষ) হইবার সম্ভাবনা থাকে।— বিশেষতঃ যে স্থূলব্যক্তিদিগের গ্রীবা অত্যন্ত খর্ব্ব, তাহাদেরই এই সন্ন্যাস রোগের অধিক আশঙ্কা। কোন কোন স্থূলদেহীর "তীক্ষ্ণাগ্নি" নামক রোগ জন্মে—ইহারা আহার করিবামাত্র ভুক্তবস্তু ভস্মসাৎ হওয়ায় পুনরায় অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় নিপীড়িত হয় এবং অসহ্য পিপাসা বেগে দগ্ধ হইতে থাকে।

স্থূলদেহীর গুণ এই—ইহারা গম্ভীর প্রকৃতি ও স্থিরবুদ্ধি হয়, ইহারা কালব্যাপিনী চিন্তা ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করে না, সুতরাং অনুতাপও ইহাদের ভাগ্যে কম ঘটে। স্বজনবিয়োগাদিতে ইহারা শোকক্ষোভে অতি-মাত্র উদ্বেলিত হয় না। প্রায়ই অল্প ভাষী ও দীর্ঘসূত্রী হয়। "মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ" এই চানক্যনীতির সর্ব্বদা অনুসরণ করিতে সক্ষম হয়। ইহাদের ক্রোধাগ্নি আধুনিক দে-সলাইয়ের কাটীতে নিহিত নয়, সেই সেকেলে ঠুনকি পাথরেই অধিষ্ঠিত। দু-চারিদিন উপবাস করিলেও শরীরের অনুভব-যোগ্য কৃশতা বা শীতগ্রীষ্মের পরিবর্ত্তনে ইহাদের হঠাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না। সংক্ষেপে ইহাদের সর্ব্বতোমুখী সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রভৃতি গুণ প্রকৃতিগত।

চরকমতে অ ত কৃশব্যক্তির দোষ এই গুলি—

ব্যায়াম মতি সৌহিত্যং ক্ষুৎপিপাসা মথৌষধং।
কৃশো ন সহতে তদ্বদ্ অতি শীতোষ্ণমৈথুনং॥
প্লীহ কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুল্মাশাং স্যুদরাণি চ।
কৃশং প্রায়ো ভিধাবন্তি রোগাশ্চ গ্রহণীমতাঃ॥

অতিশয় কৃশ ব্যক্তি ব্যায়াম বা অতিরিক্ত অঙ্গচালনা-সাপেক্ষ কর্ম্ম, অত্যন্ত উদর পূরিয়া ভক্ষণ, ক্ষুৎপিপাসার বেগ, অধিক ঔষধ সেবন, অধিক শীত বা অধিক তাপ এবং নিয়মিতাপেক্ষা অধিক স্ত্রীসংসর্গ সহ্য করিতে পারে না। এবং কৃশব্যক্তিদিগের প্রায়শঃ প্লীহা, কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, গুল্ম,

অর্শ, উদররোগ এবং গ্রহণীজাতীয় রোগ (অর্থাৎ পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন ভেদ বা কোষ্ঠকাঠিন্য সংযুক্ত রোগ) সমুদায় হইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কৃশব্যক্তির আরো এই সমস্ত দোষ—কৃশব্যক্তিরা প্রায়শঃ চঞ্চল প্রকৃতি, অধীর, মনের কথা গোপন রাখিতে অক্ষম, প্রায়শঃ অবিমৃষ্যকারী, স্বল্পনিদ্রা দুশ্চিন্তা-প্রবণ, অভিপ্রেত বিষয়ে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, আকস্মিক উদ্যম ও সত্বর অনুৎসাহ, কাম-ক্রোধাদির আশু-পরবশ ও সহসা ভীত বা সাহসান্বিত এবং সর্ব্বদাই নূতনত্ব প্রিয় হয়।

কৃশব্যক্তির গুণ—কৃশব্যক্তিরা প্রায়শঃ ক্ষিপ্রকর্ম্মা, অনলস, শ্রমপটু, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, কবিগুণান্বিত, বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যসমুদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক, পরদুঃখকাতর, কৃতাপরাধে অধিক অনুতপ্ত উন্নতিপথান্বেষী ও বাক্‌পটু হয় এবং হঠাৎ কুপিত হইলেও তদ্দণ্ডে ভুলিয়া যায়।

চরক পুনরায় বলিতেছেন—

স্থৌল্যকার্শ্যে বরং কার্শ্যং সমোপকরণৌ হিতৌ।
যদ্যভৌ ব্যাধি রাগচ্ছেৎ স্থূল মেবাতি পীড়য়েৎ॥

স্থূল ভাল, কি কৃশ ভাল এই দুইএর বিচারে বরং কৃশকেই ভাল বলিতে হইবে। যেহেতু উক্ত উভয় প্রকার ব্যক্তিই যদিও—তুল্য উপকরণযুক্ত ও তুল্য অবস্থাধীন হয় এবং একই রোগ যদি দুই জনকেই এক সঙ্গে আক্রমণ করে তাহা হইলে সে স্থলে স্থূলব্যক্তিই অতিরিক্ত উদ্বেজিত হইয়া থাকে।

স। বেশ্! আপনি ত বুঝাইয়া দিলেন—অতিরিক্ত দুইই মন্দ; তবে ভাল কে?

ক। তোমার প্রশ্নের উত্তর চরকের এই শ্লোকটীতে পাইবে—

সম মাংস প্রমাণস্তু সমসংহননো নরঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদ ব্যাধীনাং ন বলেনাভূয়তে॥

যাহাদের শরীরে মাংসের পরিমাণ কমও নয় বেশীও নয়, শরীরের অঙ্গে অঙ্গে মাংস পেশী সমুদায় আবশ্যকমত পুষ্ট ও কঠিন, যাহাদের ইন্দ্রিয় সমুদায় দৃঢ় ও কর্ম্মঠ—তাহারাই ভাল যেহেতু রোগগ্রস্থ হইলেও সেই রোগকর্ত্তৃক অধিক অভিভূত হয় না।

স। পৃথিবীতে শত করা দু-চারিজনকে স্থূলকায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়,

তাহা ছাড়া আর সকলেই ত কৃশশরীর, তবে ইহারা সকলেই কি দূষণীয়, না কৃশত্বের একটা প্রমাণ আছে ?

ক। আছে বৈকি ?

শুষ্কস্ফিগুদর গ্রীবো ধমনী জাল সন্ততঃ।
ত্বগস্থিশেষোতিকৃশঃ স্থূল পর্ব্বো নরোঃ মতঃ॥ (চরক)

যাঁহাদের নিতম্ব উদর ও গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বা মাংসহীন, চর্ম্ম পাতলা, অস্থি সরু, হস্তপদাদি শিরাসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত তাহাদিগকে অতিকৃশ বলিয়া জানিবে।

স। মনুষ্য কি কারণে কৃশ হয় ?

ক। সেবা রুক্ষান্নপানানাং লঙ্ঘনং প্রমিতাশনং।
ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ॥
রুক্ষস্যোদ্বর্ত্তনং স্নানানভ্যাসঃ প্রকৃতি র্জরা।
বিকারানুশয়ঃ ক্রোধঃ কুর্ব্বন্ত্যতি কৃশং নরম্॥

রুক্ষ অন্নভোজন, রুক্ষপানীয় (মদ্যাদি) পান, ঘন ঘন উপবাস, অত্যল্প ভোজন, অতিরিক্ত পরিমাণে মলমূত্র শুক্রাদির নিঃসারণ, শোক বা দুশ্চিন্তা, হাঁচি মল মূত্র কাম প্রভৃতি স্বাভাবিক বেগকে নির্যাতন করা, বিনাতৈলে গাত্রমর্দ্দন, স্নানের অনভ্যাস, প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ু বা বায়ুপিত্ত প্রধান ধাতু বশতঃ আজন্ম ক্ষীণতা, জরাজনিত রসরক্তাদি সর্ব্বধাতুর ক্ষয়, রোগ হইয়াছে মনে করিয়া সর্ব্বদা পরিতাপ এবং সর্ব্বদা ক্রোধ-জ্বলিত হওয়া এই সমস্ত কারণে মনুষ্য সাতিশয় কৃশ হয়।

স। কিসে শরীরের অতি স্থূলত্ব জন্মে ?

ক। অপ্রতিস্থৌল্যমতি সংপূরণাদ্ গুরু মধুর শীত স্নিগ্ধোপযোগাদ্ অব্যায়ামাদ্ অব্যাবায়াদ্ দিবাস্বপ্নাদ্ হর্ষনিত্যত্বাদ্ অচিন্তনাদ্ বীজ স্বভাবা চ্চোপজায়ন্তে।

স্বভাবতঃ বা অভ্যাস দ্বারা অধিক ভোজন, মাংস পোলাও প্রভৃতি গুরুদ্রব্য, অতিরিক্ত মিষ্টান্ন, দধি মাষকলায় প্রভৃতি শীতল বস্তু, মাখন, ঘৃত, চর্ব্বীযুক্ত মৎস্য মাংসাদি, অঙ্গচালনার অভাব, শক্তিসত্বে স্ত্রীসম্পর্ক পরিত্যাগ, দিবানিদ্রা, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কালযাপন, চিন্তারাহিত্য অথবা যে বীজে দেহসৃষ্টি তাহারই স্বপ্রকৃতি হেতু অতিশয় স্থূলতা জন্মিয়া থাকে।

স। স্থূলতা নাশের উপায় কিছু আছে কি ?

ক। যথেষ্ট।

স। তবে সে সব উপায় দ্বারা আপনার স্থূলতার হ্রাস কেন করেন না ?

ক। কৃশ ব্যক্তিকে স্থূল করা অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তিকে কৃশ করা কঠিন ? যেহেতু কৃশ ব্যক্তির পোষণজন্য ভাল ভাল আহার বিহারের বন্দোবস্ত শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে কিরূপ ?—না, তিনি যতই পোষ্টাই আহারের মাত্রা কমাইবেন ততই তিনি সফলকাম হইবেন, তজ্জন্য দেখ নিয়মপালনটা স্থূল অপেক্ষা কৃশেরই কিছু সুবিধা জনক। আমি পূর্ব্বে আরও মোটা ছিলাম, সামান্য গুটীকত নিয়মের অনুসরণ দ্বারা তবুও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ওজনে কমিয়াছি, নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সুক্ষ্মরূপে পালন করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়।—

জলত্যাগ বা অল্পজল পান, রাত্রে অন্নত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্করুটী, চিড়া ভাজা বা মুড়ী, আহারান্তে শীতল জলের পরিবর্ত্তে উষ্ণজল পান, ব্যঞ্জনে অন্যান্য ঝালের পরিবর্ত্তে অধিক গোলমরিচ ও শুঁঠচূর্ণ ব্যবহার, মসুর বনমুগ অড়হর বা কুলথ কলায়ের ডাল, নালতে চাল কুমড়ার ছেঁচ্‌কি, ভোজনের পর কোনও শাস্ত্রোক্ত তীক্ষ্ণ অরিষ্ট পান, অল্পনিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গম, অতিরিক্ত চিন্তা বা গণনার কার্য্য, পুরাতন মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়া, দুগ্ধ মাংস ঘৃত ত্যাগ করিয়া কেবল খাঁটী সর্ষপ তৈল সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি আহার, সম্পূর্ণ মাখন রহিত তক্র, যবের ছাতু, লৌহভস্ম, বেলছাল শোণাছাল গাম্ভারী ছাল পারুলছাল, এবং গণিয়ারী ছাল এই পাঁচটী একত্রে ⁄০ ছটাক লইয়া ⁄১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান, কঠিন শয্যায় শয়ন, ও নিয়মমত প্রতিদিন ২ ঘণ্টা কাল ক্লান্তিজনক ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

স। আর, কিসে কৃশতা নিবারণ হইয়া একটু মানুষের মত চেহারা হয় ? আমার যেটী আবশ্যক তাহা এখনও শুনিতে পাই নাই। শীঘ্র বলুন! শীঘ্র বলুন।

ক। স্বপ্নো হর্ষঃ সুখা শয্যা মনসো নির্ব্বৃতঃ শমঃ।

চিন্তা ব্যবায় ব্যায়াম বিরামঃ প্রিয়দর্শনং॥

নবান্নানি নবং মদ্যং গ্রাম্যানুপোদকা রসা।
সংস্কৃতানি চ মাংসানি দধি সর্পিঃ পয়াংসিচ ॥
ইক্ষবঃ শালয়ো মাষা গোধূমা গুড় বৈকৃতম্।
বস্তয়ঃ স্নিগ্ধমধুরা তৈলাভ্যঙ্গশ্চ সর্ব্বদা ॥
স্নিগ্ধ মুদ্বর্ত্তনং স্নানং গন্ধ মাল্যনিষেবনং।
শুক্লোবাসঃ যথাকালং দোষানামবসেচনং ॥
রসায়নানাং বৃষ্যাণাং যোগানাং মুপসেবনং।
হত্বাতিকার্শ্য মাংর্ত্তে নৃণা মুপচয়ং পরং ॥

অর্থাৎ সুনিদ্রা, সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ, সুখপ্রদ শয্যা, ঈশ্বর যা করেন তাই ভাল" এইরূপ আন্তরিক বিশ্বাস, শমগুণ অর্থাৎ হিংসা ক্রোধাদি ত্যাগ-পূর্ব্বক চিত্তের প্রশান্তভাব, চিন্তারাহিত্য, শুক্রের অপচয় না করা, পরিশ্রম-রাহিত্য, প্রিয়বস্তুর দর্শন, নবান্ন ভোজন, নূতন মদ্য, কচ্ছপ শূকর মহিষাদির মাংস ভক্ষণ বা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া সাধিত অন্য মাংস, দধি ঘৃত দুগ্ধাহার, ইক্ষু-প্রভৃতি, শালিধান্য মাষকলায় গোধুম গুড়োৎপন্ন মিষ্টান্ন, স্নিগ্ধ মধুর বস্তিগ্রহণ, উত্তম তৈল মাখা, ও স্নিগ্ধ বস্তুর সহিত গা-হাত-পা টিপিয়া লওয়া, নিত্যস্নান, গন্ধমাল্যাদি পরিধান, শুভ্রবেশ পরিধান, যথাকালে সঞ্চিত দোষের পরিহার, রসায়ন ও বৃষ্য ঔষধ সেবন (যথা ছাগলাদ্যঘৃত) এই সমস্ত অভ্যাসদ্বারা মানু-ষের অতিকার্শ্য দূরীভূত হইয়া দেহ স্থৌল্য উপনীত হয়।

স। আর সবত বুঝিলাম কিন্তু আপনি যে ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার দ্বারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হওয়া যায় বলিলেন কিন্তু অনেকের যে ঐরূপ গুরু আহার সহ্য হয় না, তার কি?

ক। সহ্য না হইলে মন্দাগ্নি রোগ আছে জানিতে হইবে। "প্রকৃত্যা দুর্ব্বলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ আময় দুর্ব্বলাঃ" কেহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ থাকে, কেহ রোগজন্য ক্ষীণ।

স্বভাব ক্ষীণেরা "পোষ্টাই" সেবন করিলে অনায়াসে স্থূলকায় হইতে পারে কিন্তু ব্যাধিশীর্ণ ব্যক্তিদিগের মন্দাগ্নি দূরীকরণের পূর্ব্বে কদাপি পুষ্টাঙ্গ হইবার আশা নাই। তুমি দেখিয়া থাকিবে রোগ-কৃশ ব্যক্তিরা পশ্চিমদেশে গিয়া কিছুদিন থাকিবার পর রোগ না সারিলেও একটু মোটা হইয়া আসে!

তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, রোগী এখানে যা খায়, তাহা পরিপাক পায় না, গায়েও লাগে না—আর স্থানগুণে সেখানে ভুক্তবস্তু সমস্ত জীর্ণ হইয়া শরীরের পোষণক্রিয়া সাধন করে। অগ্নিই শরীরের ক্ষয়বৃদ্ধির মূল কারণ।

স। আপনি যে বলিয়াছেন, লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে স্থূলকায় হইতে পারে; সে সব কারণগুলি ধরিয়া এক এক করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন, নতুবা আমার মনে হয়—মোটা হয় কেবল বড় লোকে, গরীবেরাই কৃশ। ধন ও দারিদ্র্যই দুইদিকে দুইটী স্পষ্ট কারণ।

ক। তুমি যা বলছ, তা নিতান্ত মিথ্যা নয়; তবে উহার মধ্যে আরও কথা আছে, ক্রমে বুঝাইতেছি। দেখ, প্রথম কারণ বলা হইয়াছে "সুনিদ্রা"; এটী কফপ্রকৃতিক সুস্থদেহীরই হইয়া থাকে; অনেক গরীব লোকের স্থূল দেহ আছে, দেখিয়া থাকিবে—সিংহাসনস্থ রাজারও না থাকিতে পারে, সুতরাং এরূপস্থলে রাজাকেও কৃশকায় হইতে হয়। দ্বিতীয় "হর্ষ"। ইহা ধরে বেঁধে হয় না, স্বাভাবিক হওয়া চাই; এটী ঈশ্বরপরায়ণ বা অবস্থাবানেরই আছে। "সুখপ্রদ শয্যা" এটী ধনীর পক্ষে। মনের নিবৃত্তি বা ঈশ্বরবিশ্বাস—এটী শুধু ধনীর নয়, যে কোনও সাধুচিত্ত ব্যক্তির হইতে পারে। নানারূপ পুষ্টিকর ভোজনে দেহ পুষ্ট হয়, তাহা ত বলাই বাহুল্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ততা না থাকিলে হইবে না, তজ্জন্যই ভোজনশীল নিমন্ত্রণ-কীট ব্রাহ্মণেরা দিব্যাহার সত্ত্বেও কৃশকায়। চিন্তারাহিত্য একটী প্রধান কারণ। দেখা যায়, কোনও ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি হইলে ক্রমে মোটা হইয়া পড়ে। তাহার কারণ—পূর্ব্বে হীনাবস্থাকালে সে চিন্তায় দগ্ধ হইতেছিল, সম্প্রতি মনের হর্ষ ও নিশ্চিন্ততা আসিয়াছে। আর গায়ে তেল বসাইয়া লইলে যে মোটা হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত পাড়াগেঁয়ে মুসলমান দরবেশেরা। ইঁহারা শিষ্য বা সেবাদাসী দ্বারা নিত্য নিত্য বহুক্ষণ ব্যাপিয়া দেহে তৈল মর্দ্দন করাইয়া লন, দেহও খুব লম্বা-চওড়া মোটাসোটা। শেষ কথা—শাস্ত্রোক্ত অমৃতপ্রাশ ছাগাদি ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর রসায়ন যোগ সমুদায়ের দ্বারা যে কৃশদেহ স্থূল হয় তাহা বহুবার দেখা গিয়াছে।

দ্রব্যগুণ বিচার।

কিস্‌মিস্‌ ও মনক্কা।

বাঙ্গালা নাম—কিস্‌মিস্‌; হিন্দী—দ্রাখ; ইংরাজী—Vitis Vini fera. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসা পিচ। মৃদ্বিকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা। সংস্কৃত নাম—দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বিকা, হারহূরা, গোস্তনী। অন্য নাম—কৃষ্ণা, চারুফলা, যক্ষ্মঘ্নী, তাপসপ্রিয়া, প্রিয়ালা, গুচ্ছফলা, অমৃতফলা, ফলোত্তমা।

কিস্‌মিস্‌ ও মনক্কা কাশ্মীর কাবুল প্রভৃতি দেশীয় এক প্রকার বিস্তীর্ণ লতার শুষ্কীকৃত ফল। এই ফল যখন থোলো থোলে গাছে ঝুলিতে থাকে তখন ইহা দেখিতে মনোরম-হরিদ্রাভ এবং অতীব শোভাময়। সংস্কৃত-সাহিত্যে সুন্দরীর ওষ্ঠ ইহার সহিত উপমিত হইয়াছে। গাছ-পাকা অবস্থায় অত্যন্ত সুস্বাদু। ডাঁসা থাকিতে থাকিতে শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়।

ইহা প্রধানতঃ দুইপ্রকারের আছে—বড়গুলিকে মনক্কা এবং বীজহীন ছোটগুলির নাম কিস্‌মিস্‌ বলে। বড়গুলির চেহারা কতকটা গরুর বাঁটের ন্যায়, তজ্জন্যই ইহার সংস্কৃত নাম "গোস্তনী"।

দ্রাক্ষা পক্কা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদু পাক রসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্ট মূত্র বিট্।
কোষ্ঠমারুত্ত কৃদ্ বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা,
হন্তি তৃষ্ণা জ্বরশ্বাস বাত বাতাস্র কামলাঃ,
কৃচ্ছ্রাস্রপিত্ত সংমোহ দাহ শোষ মদাত্যয়ান্ ॥
বৃষ্যা স্যাৎ গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বীচ বাত পিত্তনুৎ।
অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনী সদৃশী গুণৈঃ ॥

পাকা মনক্কার রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীর্য্য—শীতল; গুণ—চক্ষুর হিতকর, দেহস্থৌল্যকারক, গুরু পাক, স্বরশোধক, অধিক ভোজনে কোষ্ঠ-বায়ু-জনক, বৃষ্য, কফকর, পুষ্টিকর, রুচিপ্রদ, তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, সংমোহ (মূর্চ্ছা ও দৌর্ব্বল্যজনিত অবসাদ) দাহ, মদাত্যয় (অতিরিক্ত মদ্যপানজ মূর্চ্ছা) নাশক। প্রভাব—সারক, মলমূত্র নিঃসারক, ক্ষয়হর ও রক্তপিত্তান্তক। সংক্ষেপে, এই গোস্তনী দ্রাক্ষা

শুক্র বৃষ্য ও বাতপিত্ত হর। অবীজ ক্ষুদ্রজাতীয় গুলি (অর্থাৎ সাধারণ কিস্‌মিস্) গোস্তনীর তুল্য গুণ।

প্রয়োগ—এদেশে নানা মিষ্টান্ন ও পোলাও প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। জলখাবার রূপে শুধু অথবা অন্যান্য মেওয়া জিনিসের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রধান প্রয়োগ মৃদু রেচন পিত্তহরণ ও উৰ্দ্ধগ রক্তপিত্তে বায়ুর অনুলোমন। শিশু, স্নানশীল ব্যক্তি ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদের মুনক্কার ক্বাথ খাওয়াইলে নিরুদ্বেগে মলশুদ্ধি হয়। এই ক্বাথে কার্য্য না হইলে সোঁদালের আঠা উহাতে।০ বা ॥০ আনা গুলিয়া দিতে হয়। মউরী ও কিস্‌মিস্ কাপড়পুটলীতে রাখিয়া জলে ডুবাইয়া চুষিলে বাতপিত্ত জ্বরের পিপাসা দূর হয়। জ্বরকালে দু-চারিটী কিস্‌মিস্ সুপথ্যের মধ্যে গণ্য। হিন্দুস্থানীরা গোলমরিচচূর্ণ ও অল্প সৈন্ধবসহ ৮।১০টী মুনক্কা একটু ভাজিয়া জ্বর রোগীকে খাইতে দেয়। ইহাতে দাস্ত পরিস্কার ও শরীরের লঘুতা হয়। উৰ্দ্ধগরক্তপিত্তে খই ও কিস্‌মিস্ খাওয়া ভাল, এবং মুনক্ক ঘটিত পাচন অত্যন্ত উপকারী—যথা—মুনক্কা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, পিপুল যথাবিধি ক্বাথ কর্ত্তব্য। মৃদুরেচক ঔষধে প্রায়শঃ কিস্‌মিস্ সংযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে রেচকত্ব ও মধুরত্ব এই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শাস্ত্রোক্ত দ্রাক্ষারিষ্ট, দ্রাক্ষাদি ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে ইহা আবশ্যক হয়।

কুঁচ।

বাঙ্গালা নাম—কুঁচ; হিন্দী—শোণাকাঁইচ, চিরমিটীং; ইংরাজী Abrus Precatorius. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—রক্তিকা গুঞ্জিকা গুঞ্জা কাকজঙ্ঘা শিখণ্ডিনী, কৃষ্ণলা কাকিনী কক্ষা কনীচিঃ কাকণন্তিকা। সংস্কৃত নাম—রক্তিকা, গুঞ্জিকা গুঞ্জা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিনী, কৃষ্ণলা, কাকিনী, কক্ষা, কনীচিঃ কাকণন্তিকা।

ইহা এক প্রকার লতা গাছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু পাতা হয়, ইহাতে সরু শিমের মত ফল হয়, তাহার মধ্যে কুঁচ-বীজ থাকে। কুঁচ সকলেই দেখিয়াছেন। বাজারে বণিকের দোকানে যে যষ্টিমধু বিক্রীত হয়, তাহা এই জাতীয় গাছের মূল। শ্বেত ও লোহিত ভেদে কুঁচ দুই প্রকারের আছে।

গুঞ্জাদ্বয়ং তু কেশ্যং স্যাৎ বাতপিত্তজ্বরাপহম্।
মুখশোষ ভ্রমশ্বাস তৃষ্ণা মদ বিনাশনম্॥

নেত্রাময় হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডূব্রণং হরেৎ।
ক্রিমীন্দ্রলুপ্ত কুষ্ঠানি রক্তাচ চ ধবলাপি চ ॥
শিফা বান্তিকরী পত্রং শূলঘ্নং বিষহৃৎ তথা ॥

দুই প্রকার গুঞ্জাই কেশকর, বাতপিত্তজ্বর নাশক, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা ও মত্ততা প্রশমক; নেত্ররোগ হর, বৃষ্য, বল্য, কণ্ডূব্রণহর। ক্রিমি ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠের প্রতিকারক (শ্বেত ও রক্ত উভয়ই)। ইহার মূল বমিজনক, (অতি মাত্রায় বমিজনক, অল্পমাত্রায় কফনিঃসারক) পত্র শূলনাশক ও বিষহর (প্রলেপে)। কেশকর অর্থাৎ বীজে চিতামূল প্রভৃতির ন্যায় উগ্রতা থাকায় কেশহীন চর্ম্মকে উত্তেজিত করিয়া কেশ উৎপাদন করে। বাতপিত্তজ্বর নাশক, মত্ততাপ্রশমক—ইহার মূলের ক্বাথ। নেত্ররোগহর—পত্রের রস চোখে ফোট দিতে হয়। বৃষ্য—কুঁচ বীজ উত্তেজক বলিয়া ইহার সহিত সিদ্ধ করা তৈল শিথিলাঙ্গে প্রয়োগে উপকারী। কণ্ডূব্রণ হর=বীজসিদ্ধ সর্ষপ তৈল। ক্রিমিনাশক=ইহার সহিত সিদ্ধতৈল বাহ্যক্রিমিঘ্ন।

ইন্দ্রলুপ্ত প্রতিকারক=মস্তকের কেশ উঠিয়া গিয়া চর্ম্ম মসৃণ হইলে ইহার প্রলেপ তৎস্থান উত্তেজিত করিয়া কেশ উৎপন্ন করে। কুষ্ঠহর=বীজের প্রলেপ বা সিদ্ধ তৈল।

প্রয়োগ—ইহার মূল, পত্রের রস ও ফল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল শুষ্ক কাসে ও নানাবিধ পিত্তরোগে বিশেষ উপকারী। পত্রের রস সেবন কম্পজ্বরে উপকারী—মাত্রা আধছটাক। ইহার বীজকে "রতি" বলে এবং ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ফলের প্রধান প্রয়োগ ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠে। কুঁচ আকন্দ-মনসা-প্রভৃতি সপ্ত উপবিষের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শুনা যায় কুঁচ কাটিয়া সূক্ষ্মাগ্র করিয়া তদ্দ্বারা শূকর বিড়াল প্রভৃতির গায়ে খোঁচা দিলে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হয় ও ক্রমে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। বস্তুতঃ, ইহা একপ্রকার মৃদু বিষ, অধিকমাত্রায় উদরস্থ হইলে, বা অন্যকোনও রূপে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে মনুষ্যেরও প্রাণ নাশক হয়। ইহা একপ্রকার বিষ বলিয়াই কুষ্ঠরোগে ইহার প্রভূত শক্তি। কুষ্ঠে যে বিষের প্রয়োগ উপকারী তাহা শাস্ত্রোক্ত করবীরাদ্য তৈল, বিষ তৈল, বিষতিন্দুক তৈল, কৃষ্ণসর্পাদ্য তৈল ভল্লাতক গুড় প্রভৃতি ঔষধই তাহার প্রমাণ।

কেশ উঠাইবার জন্য একটী ইউনানী মুষ্টিযোগ এই—লাল কুঁচ খোলা ছাঁড়াইয়া ও থেঁৎলাইয়া একপোয়া লইবে এবং চারিসের গব্যদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দেড় সের থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া ১৪ দিন টাকে লাগাইলে পুনরায় চুল উঠে। ভৈষজ্যরত্ন ধৃত মুষ্টিযোগ—ভেলার আঠা, বৃহতীফল ও কুঁচফল পিশিয়া মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে টাক দূর হয়। ইহাতে ভেলার আঠা ৪।৫ ফোঁটার অধিক দিতে নাই। হাকিমেরা বলেন সাদা কুঁচ চিনিসহ ঋতুর ৩ দিন সেবন করিলে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়।

শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—কুঁচ-বীজ জলসহ পেষণ করিয়া লাগাইলে বাত-ব্যাধিজন্য স্থানিক কম্প ও নিঃসংজ্ঞতা দূর হয়।

ধবলরোগের একটী উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ—কুঁচবীজ, হীরাকস, ও সোমরাজী সমাংশে আকন্দদুগ্ধ সহ মাড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে চর্ম্মের পূর্ব্ববর্ণ আবার হয়। ভাবমিশ্র বলেন—কুঁচের ফল ও মূল সহ বিগুণ জল দ্বারা বিপাচিত সর্ষপ তৈল গণ্ডমালা দূর করে, দেখা গিয়াছে এই তৈলে মেটে সিন্দুর দিলে অধিক উপকারী হয়। কুঁচ, মনঃশিলা ও মনসার আঠাসহ গব্যঘৃত পাক করিয়া ছাঁকিয়া লাগাইলে কুষ্ঠ বা কুষ্ঠতুল্য উৎকট চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। শাস্ত্রোক্ত কেশ রোগের গুঞ্জাতৈলে টাকের মুহাদ্যতৈলে, ধবলাদি ক্ষারঘৃতে কুঁচ আবশ্যক হয়।

কুঁচিলা।

বাঙ্গালা নাম—ঐ; হিন্দী—কুচ্‌লা; ইংরাজী—Nux vomica. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—তিন্দুকশ্চ রম্যফলো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ। কুপীলুঃ কুলকঃ কালতিন্দুকঃ কালপীলুকঃ॥ কাকেন্দূ বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কট তিন্দুকঃ॥

অন্যনাম—গরদ্রুম, কারস্কর, কচির, কুপাক, বিষমুষ্টি।

গাবের গাছের মত বড় বড় গাছ হয়, সুপক্ক ফলগুলি দেখিতে কতকটা ছোট কমলানেবুর মত, ইহার মধ্যে যে বীজ থাকে তাহাই "কুঁচ্‌লে"। ভারতের মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির জঙ্গলে এই গাছ জন্মে। কুঁচলে-বীজ দেখিতে প্রায় গোলাকার, চ্যাপ্‌টা, ও প্রায় একটা আধ্‌লা পয়সার মত। বীজগুলি অত্যন্ত শক্ত, রৌদ্রে শুকাইয়া হামামদিস্তায় গুঁড়া করা অতীব কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাপার।

দুগ্ধে বা জলে সিদ্ধ করিয়া নরম হইলে শিলায় পিষিয়া লওয়া যায় ; এই রূপেই কবিরাজী ঔষধে ব্যবহারযোগ্য হয়। কুঁচলের আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত।

কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্ ॥

রস—তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—শীতল অর্থাৎ পিত্তজনিত দাহ নাশক ; বায়ুবর্দ্ধক অর্থাৎ ব্যানবায়ুর উত্তেজক (মর্ম্মার্থ এই যে শরীরের কোনও স্থান অসাড় ও রক্ত চলাচল রহিত হইলে ইহার বাহ্য বা অভ্যন্তরিক প্রয়োগে সেই দোষ দূরীভূত হয়) ইহা মদকারক, অর্থাৎ অধিক মাত্রায় মূর্চ্ছা আনয়ন করে, লঘুপাক, অত্যন্ত ব্যথানাশক (আভ্যন্তরিক প্রয়োগে শূলব্যথা ও প্রলেপে দেহের বাত বেদনা নিবারণ করে)। ইহা গ্রাহি অর্থাৎ ধারক ; এই "গ্রাহি-বিশেষণ মলমূত্র সম্বন্ধে নহে ; যেহেতু প্রত্যক্ষে ইহার এরূপ শক্তি দৃষ্ট হয় না। তবে এই বিশেষণ কেন ? যদি এই বিশেষণের সার্থকতা নিষ্পন্ন করিতে হয় তবে বলিতে হইবে ইহা শুক্রের ধারক। বস্তুতঃ, ইহা স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ রোগে যেরূপ উপকার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাকে শুক্রধারক বলিতেই হইবে। পুনশ্চ, কফ পিত্তনাশক (কফ ও পিত্ত হইতে অঙ্গব্যথা, মস্তকব্যথা, যকৃদ্দোষ, পাণ্ডুরোগ, অম্লপিত্ত, মুখের বিস্বাদ প্রভৃতি যে যে উপসর্গ হয় তৎসমস্তের প্রশমক) ইহা অস্র-নাশক অর্থাৎ পিত্তজন্য রক্তদোষনাশক।

এতৎসম্বন্ধে মতান্তর।

কুচিরঃ কটুকস্তিক্তো রুক্ষোষ্ণো দীপনো লঘুঃ।
ভেদনো রোচনো হন্তি পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্ ॥

কুঁচলে কটুতিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিদীপন, লঘু, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, রুচিকারক, এবং পাণ্ডুরোগ ও কামলারোগ বিনষ্ট করে।

প্রয়োগ—জীর্ণ জ্বর, পিত্তরোগ, অক্ষুধা, যকৃদ্দোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাত-পক্ষাঘাত হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বাতব্যাধিতে ও নানাবিধ চর্ম্মরোগে প্রয়োজ্য। কুঁচলের গুণ সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহাই মনে রাখা উচিত যে চিরতা গুলঞ্চ প্রভৃতি সাধারণ তিক্ত বস্তুতে যে যে গুণ আছে—ইহাতেও তাহাই

আছে অধিকন্তু ইহা বিষাক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক তীব্র ও অধিক আগ্নেয় ও অল্পমাত্রায় অধিক কার্য্যকারী এবং উত্তেজক।

তিক্ত বস্তু সমূহের মধ্যে কুঁচলে অতি উৎকৃষ্ট জিনিস্। আয়ুর্ব্বেদে ও ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে, তথাপি কবিরাজগণ ইহার বহুল প্রয়োগ করেন না, পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাই ইহা অধিক ব্যবহার করেন ও ইহার গুণে মুগ্ধ। ইহার কারণ কি? আপাততঃ ইহার উত্তরে মনে হয়, ইহা বড় উষ্ণ বীর্য্য সুতরাং এতৎ পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ প্রভৃতি মৃদুবীর্য্য উদ্ভিজ্জগুলিই কবিরাজেরা ব্যবহার করা সঙ্গত বুঝেন, একথা ঠিক নহে; যেহেতু দেখা যায় কবিরাজেরা কথায় কথায় মিঠাবিষ ও পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেস্থলে নবজ্বরাদি রোগে ডাক্তার মহাশয় সোরা-নিশাদল প্রভৃতির শৈত্যকর তরলসার প্রয়োগ করিতেছেন, ঠিক সেই স্থলেই কবিরাজ মহাশয় উৎকট মিঠাবিষ ও হিঙ্গুলঘটিত মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি দিতেছেন। সুতরাং মৃদুবীর্য্য-প্রিয়তাই ইঁহাদের কুঁচ্‌লার প্রতি অনাদরের কারণ নহে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র কারণ এই যে কবিরাজেরা বাঁধাগদের গণ্ডীর মধ্যে থাকেন, উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা একটী দেখিয়া আর একটী করিতে পরাঙ্মুখ। শাস্ত্রে যে দুই এক ঔষধের মধ্যে কুঁচ্‌লের প্রয়োগ আছে, সেইগুলিই প্রস্তুত করেন, কেহবা সেগুলি পরিহারও করিয়া থাকেন। ফলকথা, পরীক্ষাপরায়ণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা কুঁচলেকে যতটা চিনিয়াছেন, কবিরাজেরা ইহা ততদূর চিনিতে পারেন নাই। পুরাতন জ্বরের (বা অন্যরোগের) পাচন লিখিবার সময় কবিরাজ মহাশয় যখন চিরতা গুলঞ্চ নিমছাল কটুকী প্রভৃতি এক-ঘেয়ে তিক্ত দ্বারা লম্বা তালিকা করিতে বসেন, তখন তিনি কুঁচলের এক টুকরাকে উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলেন এরূপ কি, পাঠক মহাশয়! কখনও দেখিয়াছেন?—বোধ হয়, না। আর এক কারণ—বাঁধাবড়ীর মধ্যে যদি কুঁচলে থাকে তাহাত কবিরাজ মহাশয় অবশ্যই ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শুধু কুঁচলের মাত্রা তিনি জানিবেন কিরূপে?—কেন না শাস্ত্রে একটী বস্তুর প্রয়োগ ত বড় বেশী নাই! লোহ বিষ প্রভৃতির মাত্রা নির্ণীত আছে বটে, কিন্তু কুঁচলের ত তাহা দেখিতে পাই না। দেখা যায়, ডাক্তারেরা ইহার তরলসার (tincture) সাধারণতঃ পাঁচ ফোটা করিয়া দেন্, এখন কতটুকু কুঁচলে কত জলে কতক্ষণ

ভিজাইলে বা সিদ্ধ করিলে ঐ কাথ পাঁচ ফোঁটার তুল্য হইবে তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে যায়! সম্ভবতঃ এইরূপ নির্ণয়াভাবেও কবিরাজেরা পাচনাদিতে ইহা প্রয়োগ করেন না। যাহা হউক, আমরা বহুকালব্যাপক ব্যবহার দ্বারা ইহার মাত্রা সম্বন্ধে এইটুকু স্থির করিয়াছি—একটী কুঁচলেকে কাটিয়া তাহার সিকিভাগ (আধছটাক জলে) রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতে সেই জল পান করিলে ৩ ফোঁটা টিংচর নক্সভমিকা পানের কার্য্য হয়। অর্দ্ধঘণ্টা কাল জ্বাল দিয়া লইলেও ৩ ফোঁটার তুল্য সার নির্গত হয়। বলবান্ ব্যক্তির জন্ম আধখানা কুঁচলে ঐরূপ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই কাথ মহালক্ষ্মীবিলাস, বাতচিন্তামণি প্রভৃতির অনুপান স্বরূপ, অর্দ্দিত, (মুখ বেঁকিয়া যাওয়া) স্থানিক স্পর্শশক্তিহীনতা ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; অথবা মাষবলাদি পাচনের সহিত একটী কুঁচলের একচতুর্থাংশ দিয়া কাথ করিলেও উক্ত রোগসমূহে বিশেষ উপকারী হয়। পাকস্থলীর দৌর্ব্বল্যজনিত অতিসারেও ইহা ফলপ্রদ। ইহার কাথের সহিত ৩০ ফোঁটা কাঁচা পেপের আঠা মিশাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণরোগী সত্বর উপশম পাইতে পারে। যকৃদ্দোষজনিত অম্লপিত্তের পক্ষেও এমন মুষ্টিযোগ দুর্ল্লভ। কামলারোগে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ বা হরিদ্রাভ হইলে কুঁচলের কাথ সহ ৩।৪ রত্তি নিষাদল চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হয়। অধিক কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উহাতে হরিতকীর জল মিশানো আবশ্যক।

একটী উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ—খাঁটী সর্ষপ তৈল অর্দ্ধসের, কুঁচলের টুকরা অর্দ্ধপোয়া, শূকরের চর্ব্বী এক ছটাক, আদার রস অর্দ্ধসের, সৈন্ধব লবণ এক ছটাক, কর্পূর অর্দ্ধ ছটাক একত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈলাবশেষ করিয়া লইয়া মর্দ্দন করিলে বাত ও পক্ষাঘাতে বিশেষ উপকার দর্শায়। ধ্বজভঙ্গ রোগে শিথিল অঙ্গে এই তৈল মর্দ্দন করিলে নিস্তেজোভাব দূরীভূত হয়।

স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছাকৃত মূত্রত্যাগে কুঁচলের ব্যবহার উপকারী। অর্দ্ধটুকরা কুঁচলে, আধতোলা আমলকী ও চারি আনা কাবাবচিনি, দু আনা ফুল খড়ীচূর্ণ ও আট আনা মিশ্রী একত্রে ৮ ভরি জলে রাত্রে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত সেবন করিতে থাকিলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হয়। কোন কোন বালকদিগের অজ্ঞাতসারে মূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে,

তাহাদিগকে ।০ আনা আমলকী ও কুঁচলের অষ্টমাংশ ভিজাইয়া খাওয়াইতে হয়।

অর্শ, শূল ও রজঃ কৃচ্ছ্র রোগে কুঁচলের প্রয়োগ ফলদায়ক হইয়া থাকে। শিরোরোগেও ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দশমূলের সহিত কুঁচলে সংযুক্ত হইলে বাতশ্লেষ্মঘটিত শিরোরোগে আশ্চর্য্য উপকার দর্শায়। একটী কুঁচলে, ৵ আনা দারুচিনি ও ৵ আনা চিনি একসঙ্গে জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালি প্রশমিত হয়। ইহার চূর্ণের মাত্রা—সিকি হইতে ২ রতি। প্লীহজ্বর, অপস্মার, রক্তামাশয় এবং বহুমূত্রেও ইহার শক্তি আছে। শাস্ত্রোক্ত অজীর্ণের অগ্নিতুণ্ডী বটী, শূলের শূলের শূলহরণ যোগ, এবং কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাতের বিষতিন্দুক তৈল প্রভৃতির মধ্যে কুঁচলে আবশ্যক হয়।

কুকুন্দর।

বাঙ্গালা নাম—কুক্‌সিমা, কুকুর শোঁকা, কুকুরমুতা, পেদো মূলো বা বনমূলো ; হিন্দী—কুকুরোন্দা ; ইংরাজী—সেলাসিয়া করমাণ্ডিলিয়েনা, সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুক্কুরদ্রু মৃদুচ্ছদঃ। সংস্কৃত নাম—কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুক্কুরদ্রু, মদুচ্ছদ।

ছোট ছোট গাছ, ভূমি হইতে ডাঁটা একটু দূর উঠিয়াই চারিদিকে ছড়ানো পাতা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, পাতাগুলি বালকের হাতের পাঞ্জার ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা একটু লম্বা. পাতা অত্যন্ত কোমল, হাত দিয়া মাড়িলে একরূপ অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয়। পতিত জমিতে, দেওয়ালে, গৃহস্থের বাড়ীর ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্ত কফাপহঃ।
রক্তপিত্ত মতিসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ॥
তন্মূল মার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ॥

রস—ঈষৎ কটুতিক্ত ; বিপাক—মধুর ; বীর্য্য—শীতল ; গুণ—জ্বরঘ্ন, রক্তদোষহর, কফনিঃসারক, ঘোর দাহ নাশক। প্রভাব—রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসার প্রশমকারী, আর্দ্রমূল মুখে ধৃত হইলে মুখশোষ নাশক।

প্রয়োগ—এই গাছটী নানারূপে বড়ই উপকারী। ইহার পাতার রস একটী উত্তম রক্তরোধক। তবে উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগরক্তে অধিক কার্য্যকর। যদি রক্তস্রাব কফমিশ্রিত না হইয়া বাতপিত্ত জন্য হয়, তবে উর্দ্ধগ রক্তেও বেশ ফল দর্শায়। দাহজ্বরে ইহার রস সেবন করাইলে ও গাত্রে মাখাইলে উপশম পাওয়া যায়। সেব্য মাত্রা—২ তোলা। পিত্ত-প্রকোপকারণে রক্ত উত্তপ্ত হইয়া দূষিত হইলে ইহার রস সেবনে সেই দোষ দূরীভূত হয়। ঘামাচি চুলকানির উপরে রস মাখাইলে উপকার দর্শায়। ইহার পাতার রস মধু সেবন করিলে জমাট শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠে। পিপাসা কালে ইহার মূল মিশ্রীসহ মুখে রাখিলে কণ্ঠশোষ নিবারিত হয়। নূতন গনোরিয়া রোগে ইহার রস চিনিসহ পানে উপকার হইতে দেখিয়াছি।

ইহার প্রধান গুণ—রক্তাতিসারে, কুড়চির ন্যায় পেট গরম না করিয়া রক্তরোধ করে। বাতরোগীকে এক ব্যক্তি নিজ হস্তে একদিন মাত্র একটী মূল খাওয়াইয়া আরোগ্য করে—আমরা শুনিয়াছি, ইহা এই কুকসিমার মূল। ইহার সম্বন্ধে একটী ঘটনা আছে এই একজন মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে চলিয়া যান্, সেখানে গিয়া একটী দুঃসাধ্য রক্তামাশয় রোগীকে শুধু কুকসিমার রস খাও-য়াইয়া খাওয়াইয়া ভাল করেন। তজ্জন্য কিছু অর্থলাভও করেন। তাহার পরে বাঙ্গালা আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক কিনিয়া তিনি সেই দেশে ক্রমে কবিরাজী করিতে লাগিলেন।

কুম্‌কুম।

বাঙ্গালা নাম—কুমকুম; হিন্দী—জাফরাণ, কেশর; ইংরাজী—Saffron. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুম্‌কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরং। সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্। সংস্কৃত নাম—কুমকুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিতপর্য্যায়ের সমস্ত শব্দগুলি।

অন্য নাম—ঘস্র, কুসুমাত্মক, খল, রঞ্জ, সৌরভ, কাশ্মীরজন্ম, অগ্নিশিখ, বরেণ্য, কান্ত, গৌর।

কাশ্মীর দেশে এক প্রকার ছোট গাছ জন্মে, ইহা তাহারই পুষ্পের গর্ভ-কেশর। এই গাছ দেখিতে অনেকাংশে পেঁয়াজ-গাছের ন্যায়। ঐ সকল পুষ্প আহরণ করিয়া কাগজের উপর রৌদ্রে বা উননের উপরে অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। ইহা প্রধানতঃ কাশ্মীরেই উৎপন্ন তজ্জন্য ইহার একটী নাম কাশ্মীর বা কাশ্মীরজ। কুম্‌কুম দেখিতে রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ, এক বা দেড় ইঞ্চি লম্বা সুতার টুকরার ন্যায়, অগ্রভাগ একটু স্থূল, এবং ইহা তীব্র সদ্গন্ধযুক্ত, যেন ইহাতে রসুনের গন্ধের একটু আমেজ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে এই জিনিসের বহুল প্রচলন। যেমন এতদ্দেশে বিবাহাদি উৎসবে হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়,সেইরূপ কাশ্মীর প্রদেশে উৎসবকালে ইহার মহা সমাদর। ব্যঞ্জনাদির সুস্বাদ উৎপন্ন করিবার জন্যও ইহা উক্ত প্রদেশে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও পোলাও-কালিয়া প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের খাদ্য প্রস্তুত করিবার কালে গরম মশলার উপকরণরূপে ইহা সমাদৃত হইয়া থাকে।

ইহার কাথে বস্ত্র রঞ্জিত করিলে উহাতে অতি সুন্দর বর্ণ উৎপন্ন হয়। মাখিবার তৈলে ডুবাইয়া রাখিলে উহাতে সৌগন্ধ, সদ্গুণ ও স্বর্ণবর্ণ উৎপাদিত হয়। কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শীতপ্রধান দেশেও কুম্‌কুম জন্মে, কিন্তু তাহা তত ভাল নয়, যথা—

কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে কুম্‌কুমং যদ্ ভবেদ্ধিতৎ
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্।
বাহ্লীক দেশ সংজাতং কুম্‌কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতং।
কেতকীগন্ধযুক্তং তৎ মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্।
কুম্‌কুমং পারসীকে যন্ মধুগান্ধ তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদ্ অধমং স্থূলকেশরম্।

যে কুম্‌কুম কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি, এই কুম্‌কুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে কুম্‌কুম বাহ্লীক (বোখারা) প্রদেশে জন্মে, তাহা পাণ্ডুর বর্ণ, কেতকী পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও সূক্ষ্মকেশর বিশিষ্ট, ইহা মধ্যম এবং পারস্য প্রদেশে যে কুম্‌কুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, স্থূলকেশরও নিকৃষ্ট।

কুসকুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥

রস—তিক্তকটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত) ব্রণঘ্ন, ক্রিমিনাশক, বমিহর, বর্ণশোধক, মেচেতানাশক ও ত্রিদোষঘ্ন, প্রভাব—শিরোরোগে উপকারী।

প্রয়োগ—পূর্ব্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ইহার আক্ষেপ-নিবারক ও রজোনিঃসারক শক্তি দেখিয়া হিষ্টিরিয়া ও বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগে বিশেষ উপকারী মনে করিতেন। এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হওয়ায় আজকাল ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার অধিক প্রচলন নাই।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ মুখব্রণাদি চর্ম্মবিকারে ও শিরোরোগে। ইহা কফপ্রকৃতির রোগী ইহা নিত্য নিত্য অন্নব্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে উপকার পাইতে পারেন। মুষ্টিযোগ—(১) সিমূলের কাঁটা, জাফ্রাণ ও দুধের সর একত্রে পিষিয়া মুখে লাগাইলে মেচেতা ও মুখব্রণ দূরীভূত হয়। (২) কাঁচা হলুদের রসের সহিত জাফ্রাণ উত্তমরূপে মাড়িয়া উহাতে মাখন মিশাইয়া মস্তক মর্দ্দন করিলে মাথা-ঘুরা ও মাথার দবদবানি উপশমিত হয়। (৩) জাফ্রাণ আতপতণ্ডুল ও দারুচিনি সমানাংশে পানের রসে পিষিয়া লেপ দিলে মাথাধরা ও আধকপালে আরোগ্য হয়।

রসায়নোক্ত অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও শিরোরোগের কুম্‌কুমাদি তৈলে জাফ্রাণ আবশ্যক হয়।

কুটজ।

বাঙ্গালা নাম—কুড়চি; হিন্দী—কুরৈয়া; ইংরাজী—Wrightia antidysentrica. সংস্কৃত পর্য্যায়:—কুটজঃ কূটজঃ কোটো বৎসকো গিরিমল্লিকা কালিঙ্গ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি। ইন্দ্রোযবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুর দ্রুমঃ। সংস্কৃত নাম—কুটজ, কূটজ, কোট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প।

বড় গাছ হয়, পাতা কতকটা চাঁপা-পাতার মত (ছোট হাতের পাঞ্জার

মত) ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ, অতীব সুগন্ধিও দেখিতে মনোহর। পাড়া গাঁয়ে বন জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে।

কটুজঃ কটুকো রুক্ষো দীপন স্তবরো হিমঃ।
অর্শোতিসার পিত্তাস্র কফ তৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥

রস—তিক্তকষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—হিম; গুণ—রুক্ষ, দীপন, কফ তৃষ্ণা ও কুষ্ঠনাশক। প্রভাব—অর্শ, অতিসার ও রক্তপিত্ত প্রশমক।

প্রয়োগ—কুড়চির প্রধান শক্তি রক্তরোধকতা। এইশক্তি উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগরক্তেই অধিক দৃষ্ট হয়। রক্তার্শ ও রক্তাতিসারে ইহার ক্ষমতা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রক্তাতিসারে ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ উদ্ভিজ্জ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলে বলা যায়। স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরেও প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় রক্তপ্রদরে ইহার সহিত আমলকী প্রভৃতি শীতবীর্য্য বস্তু যুক্ত করিলে অধিক ফল হয়। আমাশয় রোগে ইহা কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা রক্তমিশ্রিত হইলে কুটজপ্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শায়। আমরক্তাতিসারে কুড়্চি নানারূপে প্রযুক্ত হয়, ইহার কাঁচা ছালের টাটকা রস, কাঁচা ছাল পোড়াইয়া তাহার রস, কাঁচা ছালের কাথ বা শুষ্ক ছালের কাথ শুষ্ক ছাল চূর্ণ পাতার কাথ, মূলের ছালের রস, ও ইহার ফল (ইন্দ্রযব) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তামাশয়রোগে যখন নাড়ীতে ঘা হইয়া নানাবর্ণের মল মিশ্রিত মাংস খসিয়া পড়িতে থাকে তখনও ইহাদ্বারা রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। নূতন ও পুরাতন উভয়প্রকার রক্তাতিসারেই কুড়্চী উপকারী, তবে পুরাতন অবস্থায় বিনাবিচারে সহসাই প্রয়োগ করা যায় কিন্তু নূতনে কখন কখন ইহা প্রয়োগার্হ নহে। পুরাতন অবস্থায় সহিত দালিমের খোলা মোচরস প্রভৃতি সংকোচক বস্তু সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরক্ত রোগে যে ইহা দ্বারা এত উপকার হয় তাহার কারণ ইহার এই কয়টী গুণ—শোষক আমপাচক ক্ষতনাশক ও রক্তরোধক। কুড়চির সহিত বেলশুঁঠ যুক্ত করিয়া উভয়ের কাথ পান করাইলে যেন সোণায় সোহাগা হয় বলিতে হইবে। কাথ করণার্থ প্রত্যেক ১ ভরি লইতে হইবে। দুঃসাধ্য অবস্থায় এ কাথে মটরপ্রমাণ আফিং সংযুক্ত করিয়া দিবে।

কুড়চিতে ক্ষতনাশক শক্তি আছে। ইহার সূক্ষ্মচূর্ণ ঘাএর উপরে ছড়াইয়া দিলে উপকার দর্শায়! কুড়চি চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে মাড়ীর ঘা ও রক্ত পড়া দূর হয়। সাধারণ লোকে নিমপাতার জলে ঘা ধুইয়া থাকে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কুড়্চি সিদ্ধজলের সহিত ঘা ধুয়াইলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হয়।

আমরক্তের কয়েকটী শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ—(১) বৎসকাদি ক্বাথ—কুটজ, আতিস, বেলশুঁঠ মুথা, বালা, সাকল্যে ২ ভরি। কুটজাদি ক্বাথ—কুটজ, দাড়িমখোলা, মুথা, বালা, লোধ, রক্ত চন্দন, ধাইফুল, আকনদ্ একত্রে ২ ভরি। যথাবিধি ক্বাথ কর্ত্তব্য। (৩) কুটজ পুটপাক—টাটকা কুড়চির ছাল উত্তমরূপে তণ্ডুলজলসহ পেষণ করিয়া জামপত্র দ্বারা বেষ্টন ও কুশদ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। বহিঃস্থ লেপ অরুণবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া রস নিংড়াইয়া ২ তোলা পরিমাণে মধুসহ সেবন কর্ত্তব্য।

কুড়চির জ্বরাতিসার নাশনেও সমধিক শক্তি আছে—জ্বরাতিসারের ব্যোষ্যাদি চুর্ণের মধ্যে অর্দ্ধেকভাগই কুড়চিছালচূর্ণ কুড়চি হইতে শাস্ত্রোক্ত কুটজাষ্টক, কুটজরস ক্রিয়া, কুটজাবলেহ,কুটজারিষ্ট প্রদবারি লৌহ গ্রহণী-মিহির তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সহর মফঃস্বলে যেখানে যে প্রসিদ্ধ রক্তামাশয়ের মুষ্টিযোগাদি আছে বলিসা প্রসিদ্ধ তাহার অধিকাংশেরই কুড়চিই প্রাণ।

কুড়।

বাঙ্গালা নাম—ঐ; হিন্দী—কুট; ইংরাজী—Sansurea Auriculata. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ং চাপ্যং পারিভাব্যং তথোৎপলম্ সংস্কৃত নাম—কুষ্ঠ, রোগের সমার্থক সমস্ত শব্দ, আপ্য, পারিভাব্য, উৎপল। অন্য নাম—কদাখ্য, দুষ্ট, জরণ, কৌবের, ভাস্বর, কাকল, কুৎসিত,পাবন, পদ্মক, কিঞ্জল্ক, হবিভদ্রক।

হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ জাত একরূপ বৃক্ষের মূল। হরিণশৃঙ্গের টুকরার ন্যায় অমসৃণ পাতলা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বণিকের দোকানে বিক্রীত হয়, ইহাতে বেশ্ একটু সুগন্ধ আছে।

কুষ্ঠ মুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্র বীসর্প কাসকুষ্ঠ মরুৎ কফান্ ॥

রস—তিক্ত কটু স্বাদু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—বাতশ্লেষ্মঘ্ন, লঘু কাসনাশক, বাতরক্ত কুষ্ঠ বীসর্প প্রশমক।

প্রভাব—শুক্রল (কটুতিক্তত্ব সত্ত্বেও)

মতান্তর—কুষ্ঠং শ্বাসং কাসকুষ্ঠং জ্বরং হিক্কাঞ্চ নাশয়েৎ। কুড়, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, জ্বর ও হিক নিবারণ করে।

প্রয়োগ—কাস রোগে প্রধানতঃ, দ্বিতীয়তঃ চর্ম্মরোগে ইহার ব্যবহার জ্বরযুক্ত কাসেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার সৌগন্ধ্যবশতঃ ডাক্তারেরা ইহাকে কর্মিনেটিভ (Carminative) শ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। বস্তুতঃ, বাতাজীর্ণে ইহার প্রয়োগ দৃষ্টফল। শ্লোকস্থিত "বাতশ্লেষ্ম" বিশেষণ দ্বারাই ইহার এই শক্তি বুঝিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ—(১) কুড় পিপুল যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী একত্রে ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ ২ বারে পান করিলে কাস আরোগ্য হয় অথবা উহাদের চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রা মধুসহ লেহন করিবে। (২) কুড় ও মনছাল সর্ষপ তৈলে সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল লাগাইলে পাচড়া ঘা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (৩) কুড়, গৃহধূম হরিদ্রা কুড় রাইসর্ষপ ও ইন্দ্রযব শুক্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ছুলি ও বিচর্চ্চিকা (কাউর আরোগ্য হয়। (ভৈঃ রত্ন) কাস-রোগের (বিশেষতঃ শিশুর জন্য) শাস্ত্রোক্ত সহজ অথচ অতি ফলপ্রদ যোগ পুষ্করাদি চূর্ণ—কুড়, আতইচ্, কাঁকড়াশৃঙ্গী পিপুল, দুয়ালভা প্রত্যেক সমভাগ মধুসহ লেহন কর্ত্তব্য। কুড়, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটেরকুঁড়া মসুর দাইল একত্র জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা দূর হইয়া মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়। (ভৈঃরত্ন) অগ্নিমান্দ্যরোগের অগ্নিমুখ চূর্ণের মধ্যে কুড় বহু পরিমাণে প্রযুক্ত হয়, যথা—

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্ ॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরিতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠ মষ্টগুণং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ হিং ১ ভাগ বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরিতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, দধির মাত, সুরা অথবা উষ্ণজলের সহিত সেবনে উদাবর্ত্ত, বাতাজীর্ণ, আমাজীর্ণ, প্লীহা ও কাসরোগ আরোগ্য হয়। ইহা সহজ অথচ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শাস্ত্রোক্ত স্বরভঙ্গের কল্যাণাবলেহ ও ব্রহ্মীঘৃতে, কাসের সমশর্কর লৌহ ও শৃঙ্গারাভ্রে শিশুরোগের কুমার কল্যাণ ঘৃতে, চর্ম্মরোগের বৃহৎ মরিচাদি ও কন্দর্পসার তৈলে এবং বাতব্যাধির নানা তৈলে কুড় আবশ্যক হয়।

কুন্দুরু।

বাঙ্গালা নাম—কুন্দুর খোটী; হিন্দী—বেরোজা; A sort of resin. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি। সংস্কৃত নাম—কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ, কুন্দ।

ইহা বসওয়েলা ফ্লোরিণ্ডা (শল্লকী) নামক বৃক্ষের ধুনাযুক্ত নির্য্যাস। এই নির্য্যাস গোলাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ; স্বচ্ছ, ভঙ্গুর, উগ্র, রুক্ষাস্বাদ ও রুক্ষ সদ্‌গন্ধযুক্ত, অগ্নিসন্তাপ পাইলে অধিকতর সুগন্ধ নির্গত হয়। খোট্টাপশারীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

> কুন্দুরু র্মধুর স্তিক্ত স্তীক্ষ্ণ স্ত্বাচ্যঃ কটু র্হরেৎ।
> জ্বর স্বেদ গ্রহালক্ষ্মী মুখরোগকফানিলান্‌
> দাহপ্রদর পিত্তাস্ত্রী লেপনাচ্ছৈত্যদঃ পরঃ॥

রস—মধুর তিক্তকটু; বিপাক—কটু; বীর্য্য—উষ্ণ; গুণ—তীক্ষ্ণ ত্বক্‌দোষনাশক, কফবাতঘ্ন, জ্বর, দাহ ও পিত্তরোগহর, লেপনে শৈত্যপ্রদ (প্রদাহনাশক) প্রভাব—প্রদর (শ্বেত) নাশক ও মুখরোগহর। কোমল-স্থানের ক্ষতে বিশেষ উপকারী, তজ্জন্যই যোনি মধ্যস্থিত ক্ষত জন্য শ্বেতস্রাব ও মুখগহ্বরস্থ ক্ষতের প্রশমন করে।

প্রয়োগ—কাস, ক্ষত, ব্রণ, শ্বেতপ্রদর ও মেহে প্রয়োজ্য। চূর্ণের মাত্রা (আভ্যন্তরিক) ৫ হইতে ১৫ রতি। মধুসহ লেহন করিতে হয়। চক্রদত্ত লিখিয়াছেন গোধূম ও কন্দুর, মেষদুগ্ধসহ পেষণ ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্নশূল নিবারিত হয়। কুন্দুরু অর্দ্ধ ছটাক গর্জ্জন তৈল ও

মোম প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক উত্তাপ সংযোগে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ইহা সর্ব্বপ্রকার ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ হয়। গৃহে সদ্‌গন্ধযুক্ত ধূম দিবার সময়া অন্যান্য মশলার সহিত ইহা ব্যবহার করা ভাল।

কুম্‌ড়া।

বাঙ্গালা নাম—কুম্‌ড়া; হিন্দী—কোঁহড়া; ইংরাজী—Benin casa. cerifera. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—কুষ্মাণ্ডং স্যাৎ পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্। সংস্কৃত নাম—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প, বৃহৎফল। অন্যনাম—ঘৃণাবাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, কর্কারু, শিখিবর্দ্ধক, সুফলা, নাগপুষ্পফলা।

ইহা মনুষ্যের একটী অনায়াস-লভ্য খাদ্য, বহুল পরিমাণে জন্মে, ঘরে সঞ্চিত থাকিলে পচে না, অল্পমূল্যে অধিক ওজনে পাওয়া যায়। সুতরাং গরিব বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে মহোপকারী—অন্য কিছুর অভাবে অন্ন গলাধঃ করাইবার অধম-তারণ সহায়। ইহা রোগীর অপথ্য, কিন্তু সুস্থের পক্ষে বলপুষ্টিকর।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্র বাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতি হিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥

সদ্যঃপক্ক কুষ্মাণ্ড (যাহা পাকা অথচ ঘরে বহুদিন রাখা হয় নাই এরূপ কুমড়া শরীরের পুষ্টিকর, শুক্রকর, ঈষৎ গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। কচি কুমড়া পিত্তনাশক ও শীতল, মধ্যম কুমড়া কফকর এবং অত্যন্ত পাকা কুমড়া, অতিশীতল নহে, মিষ্টাস্বাদ, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিদীপক ও লঘুপাক, ইহা প্রস্রাবকারক, হৃদ্রোগনাশক ও ত্রিদোষহর।

কুম্‌ড়া গাছ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, ইহাকে চাল্‌কুম্‌ড়া, ছাঁচিকুমড়া সাদা কুম্‌ড়া বা দেশী কুম্‌ড়া বলে; হরিদ্রাভ মিষ্টাস্বাদ যুক্ত যে কুম্‌ড়া, যাহা মিটুকুমড়া, সূর্য্যকুমড়া, বিলাতী কুম্‌ড়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়) তাহা এই জাতীয় কুমড়া হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন। চাল্ কুমড়া ঘরের ছাদে বা উচ্চ মঞ্চের উপরে জন্মে, শেষোক্ত কুমড়া ভূমির উপরে উৎপন্ন হয়। এই মিষ্ট কুমড়া যদিও ঔষধোপকরণরূপে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ইহার একটী প্রধান গুণের জন্য এস্থলে ইহার উল্লেখ করিতে হইল; সে গুণটী এই।

দুর্গা-স্তোত্রম্

(হিমালয়-কৃতম্)

(১)

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে
ত্বং সর্ব্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।
ত্বং বিষ্ণু র্গিরিশ স্ত্বমেব হি সুরা ধাতাঽসি শক্তিঃ পরা
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং শিবে॥

এই ত্রিসংসার মাগো! চরাচরময়
তোমারি স্বরূপ বিনা কিছু আর নয়!
তুমি বিশ্বেশ্বরী মাগো! তুমি বিশ্বধরী,
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন হও মা শঙ্করি!
তুমিই এ ত্রিসংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর!
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি পূর্ণশক্তি, তুমি দেবতা নিকর!
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তোমার যখন
চরিত্র বর্ণিতে নাহি পারে কদাচন,
তখন অধম আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!

(২)

ত্বং স্বাহাঽখিলদেবতৃপ্তিজনিকা পিত্রাদিষু ত্বং স্বধা
তৃপ্তেস্ত্বং জনিকা সদৈব জগতাং ত্বং দেবদেবাত্মিকা।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তপো দক্ষিণা
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥

যাবতীয় দেবতার তৃপ্তির কারণ
যে আহুতি দেয় লোক অনলে যখন,

সেই পুণ্য ঘৃতাহুতি, স্বাহা নাম যার,
তব নামান্তর বিনা কিছু নয় আর!
মৃত-পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তির কারণ
পিণ্ড জল যাহা কিছু যে দেয় যখন,
সেই পুণ্য পিণ্ড জল, স্বধা যার নাম,
তব নামান্তর তাহা, সার বুঝিলাম!
তুমিই এ জগতের তৃপ্তির কারণ,
দেবদেব মহাদেব তব প্রাণধন।
তুমি হব্য, দেবলোক-তৃপ্তির কারণ,
তুমি কব্য, পিতৃলোক-তৃপ্তির সাধন।
তুমিই স্বয়ং যজ্ঞ, তুমিই দক্ষিণা,
স্বর্গাদি যা কিছু ফল, তোমারি কল্পনা।
ওমা সর্ব্ব-ফল-দাত্রি! ওমা বিশ্বেশ্বরি!
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি!

(৩)

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্‌ যোগিনো বিদ্যয়া
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ সুগুপ্তং তব।
বাচাঙ্কাতিগমং মনোঽতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে
ভক্ত্যাঽহং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্‌॥

অতি সূক্ষ্মতম রূপ জননি! তোমার,
যাহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই আর;—
যোগবলে বলে যাকে যোগী সমুদয়
বিশুদ্ধ, সুগুপ্ত পুনঃ পূর্ণব্রহ্মময়।
বাক্য-অগোচর তুমি, চিত্ত-অগোচর,
তোমার "ত্রিলোক-বীজ" নাম নিরন্তর।
তুমি শিবময়ী, তুমি বর-প্রদায়িনী,
ভক্তিভরে নমি আমি তোমায় জননি!

বিপদে পড়েছি মাগো! দুঃখে ফাটে প্রাণ,
ওমা বিশ্বেশ্বরি! মোরে কর পরিত্রাণ!

(৪)

উদ্যৎসূর্য্যসহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া
দেবীমষ্টভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলিং শুভাম্।
উদ্যংকোটিশশাঙ্ককান্তিমমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং
ভক্ত্যাঽহং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে॥

সহস্র উদীয়মান সূর্য্যের সমান
তোমার উজ্জ্বল কান্তি হয় অনুমান।
মোর ঘরে জন্ম নিলে করিয়া করুণা,
তুমি দেবী অষ্টভুজা, বিশাল-নয়না।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে তব কিবা শোভা ধরে,
পরম মঙ্গলময়ী তুমিই সংসারে।
আকাশেতে কোটী চন্দ্র হইলে উদয়,
তোমার কান্তির সনে তবে তুল্য হয়।
তুমি সুনির্ম্মলা বালা ত্রিনেত্র-ধারিণী,
একমাত্র শিবময়ী তুমিই জননি!
ওমা জগন্মাতঃ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন হও মা! সদা আমার উপরে!

(৫)

রূপং তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলং
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈ র্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্।
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে
ভক্ত্যাঽহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে॥

তোমার রূপের কথা কি বলিব আর,
রজত-পর্ব্বত সম শুভ্র অনিবার।

নাগেন্দ্র তোমার মাগো ভূষণ উজ্জ্বল,
তব শিরে রহে পঞ্চ বদন-কমল।
ভীষণ ত্রিনেত্র-মূর্ত্তি করেছ ধারণ,
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে তব শোভে সর্ব্বক্ষণ।
জটাভার ধরিয়াছ মস্তকে জননি!
তুমি শুভময়ী, তুমি আশ্রয়-দায়িনী।
ওমা জগন্মাতঃ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন হও মা! নিত্য আমার উপরে,

(৬)

রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং
দিব্যৈরাভরণৈর্ব্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
দিব্যৈর্ব্বাহুচতুষ্টয়ৈঃ সুমিলিতং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদিদেবস্তুতে॥

তোমার রূপের ছটা নিত্য বিদ্যমান,
কোটী শরতের চন্দ্র ব'লে অনুমান।
পরম সুন্দর বস্ত্র কর মা ধারণ,
কিছুই সুন্দর নাই তোমার মতন!
দিব্য আভরণে তব শোভা অনিবার,
রূপের ছটায় তব ভুলে ত্রিসংসার।
ধারণ করেছ তুমি বাহু-চতুষ্টয়,
করে মা! তোমার পূজা দেবতা-নিচয়।
ভক্তিভরে পূজি তব চরণ-কমল,
মোর প্রতি তুষ্ট মাগো! হও অবিরল!

(৭)

রূপং তে নবনীরদদ্যুতিধরং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্।

বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিণি
ভক্ত্যাহহং প্রণতোহস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥

নবীন নীরদ সম তোমার বরণ,
প্রস্ফুটিত পদ্ম সম তোমার নয়ন।
ভুলায় তোমার কান্তি এই ত্রিসংসার,
মৃদু মন্দ হাস্য তব মুখে অনিবার।
রতন-কেয়ূরে তুমি শোভিছ সুন্দর,
বনমালা বক্ষে তব কিবা মনোহর।
রক্ষা করিতেছ তুমি এই ত্রিভুবন,
ভক্তিভরে পূজা করি তোমার চরণ।
করিয়া আমার প্রতি করুণা সদাই
সুপ্রসন্ন থাক মাগো! এই ভিক্ষা চাই!

(৮)

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগৈ র্দেবোহথবা মানুষঃ।
যৎ কিং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈ র্গুণৈ
র্নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥

কিবা দেব, কিবা নর, এই ত্রিসংসারে
যত্ন করিলেও যুগযুগান্তর ধ'রে,
তথাপি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর
বর্ণন করিতে পারে হেন সাধ্য কার?
তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া!]
নিজগুণে কৃপাবিন্দু করিয়া সঞ্চার
মায়াপাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর;
মায়ার সমুদ্রে আছি মগ্ন অবিরাম,
ওমা বিশ্বেশ্বরি! তব চরণে প্রণাম!

(৯)

অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যৎ ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা॥

এতদিনে হলো মোর জনম সফল,
এতদিনে সিদ্ধ মোর তপস্যার ফল।
ত্রিজগন্মাতা তুমি আসি মোর ঘরে
কন্যা-রূপে জন্ম নিলে মোরে কৃপা ক'রে!

(১০)

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজলীলয়া।
নিত্যাপি মৎগৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ॥

ধন্য ধন্য ধন্য মাগো! জনম আমার,
সার্থক জীবন মোর, বুঝিলাম সার!
তাহা যদি না হবে মা! তবে কি কারণ
হইয়াও এ সংসারে তুমি নিত্য ধন,
লীলাচ্ছলে তুমি মোর কন্যারূপ ধরি
পিতা ব'লে ডাকিলে মা! মোরে কৃপা করি।

(১১)

কিং ব্রুমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্।
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাঽভবত্তব॥

ধন্য ধন্য ধন্য মাগো! ভাগ্য মেনকার,
শতজন্মে কত পুণ্য ছিল মা! তাহার।
ত্রিজগন্মাতা হ'য়ে কন্যারূপ ধরি
মাতা ব'লে ডাকিলে মা! তারে কৃপা করি!

দুর্জ্জন-নিন্দা।

(১)

দুর্জ্জনং প্রথমং বন্দে সুজনং তদনন্তরম্।
মুখপ্রক্ষালনাৎ পূর্ব্বং গুহ্যপ্রক্ষালনং যথা॥

আগেই বন্দনা করি দুর্জ্জন-চরণ,
শেষে সুজনের পদ করিব বন্দন।
প্রমাণ দেখ না কেন, লোকে শৌচে গিয়া
আগে ধোয় গুহ্যদেশ মুখ না ধুইয়া।

(২)

দুর্জ্জনঃ সুজনো ন স্যাদুপায়ানাং শতৈরপি।
অপানং মৃৎসহস্রেণ ধৌতং চাস্যং কথং ভবেৎ॥

করুক যতই চেষ্টা লোকে সর্ব্বক্ষণ,
তথাপি দুর্জ্জন কভু না হয় সুজন।
হাজার লাগাও মাটী মার্গেতে লেপিয়া,
যে মার্গ সে মার্গ রয়, মুখ না হইয়া!

(৩)

খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননোঽহরৎ সীতাং বন্ধনন্তু মহোদধেঃ॥

দুর্জ্জন করিবে দোষ, একি সর্ব্বনাশ!
কুফল তাহার সাধু ভোগে বারমাস।
সীতারে করিল চুরি দুষ্ট দশানন,
সমুদ্রের ভাগ্যে কিন্তু ঘটিল বন্ধন!

(৪)

নিষ্ণাতোঽপি চ বেদান্তে সাধুত্বং নৈতি দুর্জ্জনঃ।

যতই বেদান্ত পাঠ করুক দুর্জন,
তথাপি কিছুতে সে না হইবে সুজন।
হায় রে মৈনাক-গিরি সমুদ্র ভিতরে
ডুবিয়া রয়েছে দেখ চিরদিন ধ'রে ;
কিন্তু মনে ভেবে দেখ তুমি অবিরল,
কিছুতেই কভু তাহা না হ'লো কোমল !

(৫)

ন বিনা পরবাদেন রমতে দুর্জনো জনঃ।
শ্বা হি সর্ব্বরসান্ ভুক্ত্বা বিনা মেধ্যং ন তৃপ্যতি ॥

পরনিন্দা বিনা আর যেজন দুর্জন
কিছুতেই মনে সুখ না পায় কখন।
কুকুর সুমিষ্ট দ্রব্য করে পরিহার,
বিষ্ঠা খাইলেই কিন্তু তৃপ্তি হয় তার !

(৬)

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রসীদতি।
অকারণদ্বেষি মনোহস্তি যস্য বৈ কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি ॥

কারণ দেখিলে তবে ক্রোধ যার হয়,
সে কারণ গেলে, তাহা নাহি আর রয়।
নাহি যার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
অথচ যদ্যপি ক্রোধ করে সেই জন,
হেন জন কেবা কোথা রয় এসংসারে,
যেজন তাহারে তুষ্ট করিতে বা পারে !

(৭)

সংবর্দ্ধিতোহপি ভুজগঃ পয়সা ন বশ্য
স্তৎপালকানপি নিহন্তি বলেন সিংহঃ।
দুষ্টঃ পরৈরুপকৃতস্তদনিষ্টকারী
বিশ্বাসলেশ ইহ নৈব বুধৈর্বিধেয়ঃ ॥

দুধ দিয়া সর্পে তুমি করহ পালন,
তবু সে তোমার বশে না আসে কখন।
সিংহকে পালন কর পুষিয়া তাহায়,
তবু সে তোমারে খাবে বাগে যদি পায়।
দুর্জনের উপকার করে যেই জন,
তাহারি অনিষ্ট করে দুর্জন তখন।
যেই জন বুদ্ধিমান্ হয় এ সংসারে,
সেজন কারেও যেন বিশ্বাস না করে!

(৮)

অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনে পরযোষিতি চ স্পৃহা।
স্বজনবন্ধুজনেষসহিষ্ণুতা প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি দুরাত্মনাম্॥

কিছুমাত্র দয়া মায়া কভু না রাখিবে,
কারণ না থাকিলেও বিবাদ করিবে,
দেখিলে পরের ধন নিতে ইচ্ছা যায়,
দেখিলে পরের নারী ইচ্ছা করে তায়,
কিবা সাধু জন, কিবা নিজ বন্ধু জন
কারো প্রতি সহ্য গুণ না রাখে কখন;
যেজন পরম দুষ্ট এ সংসারে হয়,
হাড়ে হাড়ে এই সব দোষ তার রয়!

(৯)

গজতুরগশতৈঃ প্রযান্তু মূর্খা ধনরহিতা বিবুধা প্রযান্তু পদ্ভ্যাম্।
গিরিশিখরগতাপি কাকপালী পুলিনগতৈর্ন সমেতি রাজহংসৈঃ॥

হাতী ঘোড়া চড়িয়াও যথায় তথায়
গমন করুক মূর্খ সুখ কিবা তায়?
দরিদ্র পণ্ডিত যদি পায়ে হেঁটে যান,
তবু তাঁর তাহে সুখ, হেন অনুমান।

কাক যদি ব'সে রয় পর্ব্বত-শিখরে,
তবু তার "কাক" নাম চিরদিন ধ'রে।
চড়াতেও রাজহংস যদি করে বাস,
তবু তার "রাজহংস" নাম বারমাস।
একবার ভেবে দেখ তুমি মনে মনে,
কাকের তুলনা হয় রাজহংস সনে?

(১০)

প্রায়ঃ স্বভাবমলিনো মহতাং সমীপে
তিষ্ঠন্ খলঃ প্রকুরুতেহর্থিজনোপঘাতম্।
শীতার্দ্দিতৈঃ সকললোকসুখাবহোহপি
ধূমে স্থিতে নহি সুখেন নিষেব্যতেহগ্নিঃ॥

মলিন-স্বভাব যার সেই খল জন
মহৎ লোকের কাছে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
খারাপ করিয়া দিয়া কাণ দুটী তার,
ভিক্ষুক জনের কত করে অপকার।
আগুণ পোহায়ে সুখ শীতের সময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যদি ধূম তথা রয়,
সে আগুণ পোহাইয়া শীতার্ত্ত যেজন,
কিছু মাত্র সুখ নাহি পাইবে তখন!

(১১)

ধূমঃ পয়োধরপদং কথমপ্যবাপ্য বর্ষাম্বুভিঃ শময়তি জ্বলনস্য তেজঃ।
দৈবাদবাপ্য কলুষপ্রকৃতি র্মহত্বং প্রায়ঃ স্ববন্ধুজনমেব তিরস্করোতি॥

অগ্নি হ'তে যত ধূম উঠিয়া গগনে
মেঘরূপে জন্ম লয়, জানে সর্ব্বজনে।

তার পর সেই মেঘ ঘোর বৃষ্টি দিয়া।
সেই অগ্নিকেই দেয় নির্ব্বাণ করিয়া।
যে জনের স্বভাবতঃ অতি ক্ষুদ্র মন,
পায় যদি উচ্চপদ কভু সেই জন,
অমনি নিজের শক্তি করিয়া বিস্তার,
সর্ব্বনাশ ক'রে দেয় আত্মীয় জনার!

(১২)

বন্দ্যান্নিন্দতি দুঃখিতানুপহসত্যাবাধতে বান্ধবান্
শূরান্ দ্বেষ্টি ধনচ্যুতান্ পরিভবত্যাজ্ঞাপয়ত্যাশ্রিতান্।
গুহ্যানি প্রকটীকরোতি ঘটয়ন্ যত্নেন বৈরাশয়ং
ব্রূতে শীঘ্রমবাচ্যমুজ্ঝতি গুণান্ গৃহ্নাতি দোষান্ খলঃ॥

পূজ্য জনে নিন্দা করে দুষ্ট বারমাস,
দুঃখীর দেখিয়া দুঃখ করে উপহাস,
বন্ধুর উপরে দেয় বিপত্তি অশেষ,
সাহসী লোকেরে দেখি ক'রে থাকে দ্বেষ,
পূর্ব্বে ধনী ছিল, কিন্তু ধন গেছে সব,
এ হেন লোকেরে দেখি করে পরাভব।
জুলুম করিবে তারে যেজন আশ্রিত,
প্রকাশ করিয়া দিবে গুপ্ত কথা যত।
পথের ঝগড়া কিনে ল'য়ে আসে ঘরে,
অবাচ্যও যাহা তাহা মুখ হ'তে সরে,
গুণ দেখিলেও তাহা না বলে কখন,
দোষ পাইলেই কিন্তু হন্ পঞ্চানন!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে বি, এ।
২৬।২ বৃন্দাবন পালের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।